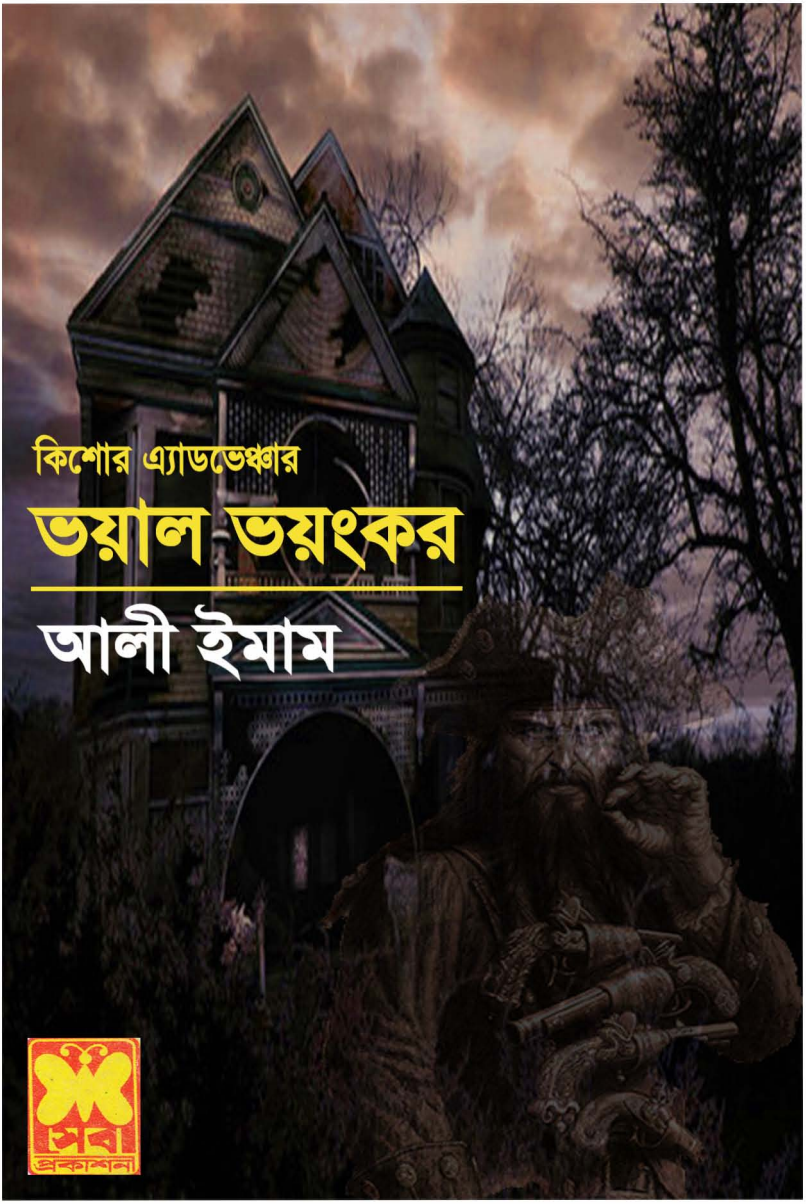
কিশোর এ্যাডভেঞ্চার
ভয়াল ভয়ংকর
আলী ইমাম
সবা
প্রকাশনা

দুঃসাহসী পাঁচ-১

কিশোর এ্যাডভেঞ্চার

ভয়াল ভয়ংকর

আলী ইমাম

নিবেদন

সেটা ছিল আমার টুলবেঞ্চের দিন। ক্লাশ সেভেনে পড়ি। নওয়াবপুর সরকারী স্কুল। পুরনো ঢাকায় বেড়ে উঠেছি। এক-দিন ক্লাশে এসে শুনি এক গা ছমছমে কথা। বনগ্রামের এক কবিরাজ বাড়ির কুয়ো থেকে একটি ছোট ছেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ছেলেটির শরীর ফ্যাকাসে। যেন শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কেউ বের করে নিয়েছে। সেই কবিরাজকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তখন মাঝে মাঝে রক্তচোষার কথা শুনতাম। সন্ধ্যার আগেই খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে আসতে বলতেন বড়রা।

আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম বনগ্রামের সেই পুরনো, ঝুরঝুরে বাড়িটি দেখতে। ঝুঁকে তাকিয়েছিলাম কুয়োর ভেতরে। থিকথিকে অন্ধকার। একটা চিল ডাকছিল সজনে ডালে বসে। কুয়োর নিচ থেকে কিছু হাড় তোলা হয়। দেখে আমার শরীর শিরশির করে। মনে হয় এই চারপাশের পৃথিবীতেই মিশে আছে এমনি কতো রহস্য। ঘটছে নানা ভয়ংকর ঘটনা।

তখন রহস্য কাহিনী পড়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। পাড়ার পাঠাগার থেকে নিয়ে পড়ছি হেমেন্দ্র কুমার রায়ের বই। যকের ধন। আবার যকের ধন। মরণ খেলার খেলোয়াড়।

সে সব বই তখন রীতিমতো আছন্ন করে রাখতো। হেমেন্দ্র কুমারের লেখা চমৎকার একটি কল্প উপন্যাস পড়েছিলাম। মেঘদূতের মর্তে আগমন।

কি অদ্ভুত ভাবে তখন টেনে নিয়ে যেত হেমন্দ্রকুমারের গদ্য। সম্মোহনী শক্তি লুকিয়ে ছিল তার ভেতরে।

সেই দুঃসাহসী কুমার আর বিমলের কথা। তাদের সংগী একটি কুকুর। রহস্যের খোঁজে তারা যায় সিলেটের পাহাড়ে। খাসিয়াদের গ্রামে। আসামে। জৈন্তায়।

হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাকে যেন নিয়ে গেলেন অন্য এক পৃথিবীতে। নিঝুম দুপুরে চিলেকোঠায় বসে সেসব মনকাড়া বই পড়ি। সময় কোথা দিয়ে পালিয়ে যায় একদম টের পাই না। চোখ শুধু বই এর পাতায়। রহস্যের ঝিলিক। মন চলে যায় ঘটনার জায়গাগুলোতে। আফ্রিকার পটভূমিতে লেখা শ্বাসরুদ্ধ কর এক বই—সূর্য নগরীর গুপ্তধন। মন হারিয়ে যায় কালো আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে। কিলিমানজারো পাহাড়ের নিচে। রত্নপাথরের গুহাতে। বিশাল এ্যানাকোণ্ডা সাপ সেখানে পাহাড়া দেয় ফোঁস ফোঁস করে। নির্জন দ্বীপ। বাহামা দ্বীপের কাহিনী। জল দস্যুদের ঘাঁটি।

আমার কিশোরকালকে নানা উত্তেজনায় ভরিয়ে রেখেছে এ সব গল্প। রোমাঞ্চ উপাখ্যান। শিহরণে ভরা কাহিনী। রাতের বেলায় ভুতুড়ে কাহিনী পড়ে ভয় পাওয়া। কিশোরদের জন্যে এক সময় চমৎকার কিছু রহস্য কাহিনী লেখা হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। তিরিশের দশকে লিখেছিলেন 'মামাবাবু ফিরেছেন' নামে একটি অভিনব উপন্যাস। বাংলা ভাষার লেখা প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী। বার্মার পাহাড়, আন্দামান নিকোবর দ্বীপ নিয়ে লেখা রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। প্রেমেন্দ্র মিত্র অতুলনীয় ভাবে সৃষ্টি করেছেন ঘনাদা নামের এক চরিত্রকে। কোলকাতার বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের এক মেসবাড়িতে বসে যিনি তার গল্পের ঝুলি থেকে বের করেন বিচিত্র সব ভৌগোলিক উপাখ্যান। তার লেখা পড়ে দূর লাতিন আমেরিকার আন্দিজ পাহাড়ের কণ্ডর শকুনের ডিম সংগ্রহ করতে যাওয়ার ঘটনা থেকে রাশিয়ার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথালীন

দ্বীপপুঞ্জের সীল মাছ শিকারীদের অভিযান কাহিনী জেনেছি। বাংলা কিশোর সাহিত্যের ভূগোলকে বিস্তৃত করলেন তিনি। ঘনাদার গল্পে যেন পাহাড়, সমুদ্র আর সুদূরের কোন নির্জন দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি। পদে পদে যেখানে উত্তেজনা।

বিভূতিভূষনের 'চাঁদের পাহাড়' প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করেছিল। বুনিপ নামের সেই অদ্ভুত জন্তুটির কথা ভুলতে পারিনি। আমাদের বিভিন্ন এলাকার বৈচিত্র কি কম। সহজেই এগুলো হয়ে উঠতে পারতো শিশু কিশোরদের জন্যে লেখা বিভিন্ন রহস্য কাহিনীর আকর্ষণীয় পটভূমি। সম্প্রতি দেখছি বিদেশী পটভূমিতে লেখা দেদার কিশোর এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী আমাদের এখানে প্রকাশিত হচ্ছে, জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরাকীর্তির বিভিন্ন স্বাক্ষর। অতীতের বিভিন্ন নিদর্শন। পাহাড়পুর, ময়নামতী কিংবা কান্তজীর মন্দিরের পটভূমিকায় কি লেখা হতে পারে না এমন কাহিনী যা আমাদের শিশু কিশোরদের রোমাঞ্চকর কাহিনীর পাশাপাশি পরিচয় করিয়ে দেবে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। আমাদের তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ বিচিত্র জনপদের সাক্ষী। এদেশের বনজ সম্পদ, পাহাড়, উপজাতিদের বিচিত্র জীবন, বার্মা, পাবলাখালির অভয়ারণ্য, কাপ্তাই লেকের বিস্তৃতি, চিম্বুক পাহাড়ের উচ্চতা, হাওর অঞ্চলের যাযাবর পাখিদের আবাস সহজেই হয়ে উঠতে পারে লেখার আকর্ষণীয় উপাদান।

টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রমাণ্য অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে গিয়ে এদেশের বিচিত্র প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছি। দেখেছি শীতের সকালে তেঁতুলিয়ার কুয়াশা ঢাকা ঘন আবরণে কেমন করে রোদ ছড়িয়ে যায়। আবহাওয়া ভালো থাকলে সেখান থেকে দেখা যায় দূর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, কাছেই তো তরাইয়ের ঘন বন। ডুয়ার্সের জংগল। সিকিম, ভুটানের বিচিত্র পাহাড়ি জীবন। গুম্ফার

রহস্যময় আলো আঁধারির ভেতরে লামা পুরোহিতদের অদ্ভুত কণ্ঠে মন্ত্রের উচ্চারণ। সেখানে সঞ্চিত রয়েছে অনেক অজানা রহস্যে ভরা পুথি। রত্নপাহাড়ের সঞ্চয়। মহেশখালির পানের বরোজে দাঁড়িয়ে দেখেছি বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া জ্বল জ্বল করছে শেষ বিকেলের রোদে। নীল বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে গেছি মাছ ধরার ট্রলারে করে। বন্দর মোকাম থেকে শাহ পরি দ্বীপ। সেখান থেকে নারকেল বনে ঢাকা প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস্। কি বিচিত্র আমার দেশ। কোথাও উত্তর বঙ্গের লাল মাটি খুঁড়ে মেটে আলু তুলছে কৃষকের ছেলে। অন্যদিকে সেন্ট মার্টিনসের সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে শুকনো শ্যাওলা কুড়াচ্ছে জেলের ছেলেরা। কুয়াকাটার সৈকতের অপরূপ সূর্যাস্ত দেখে মনে হয়েছে মিয়ামীর সূর্যাস্ত কি এর চাইতেও সুন্দর! ড্যাফোডিল, টিউলিপের চাইতে আমাদের ঘাসফুল, কলমিলতা, হেলেঞ্চার ডগা, কচুরীপানার বেগুনি ফুল কতো অপূর্ব!

কাজল মাটির প্রতি সেই ভালোবাসা থেকে, সেই মুগ্ধ বিস্ময় থেকে ভেবেছি কিশোরদের কাছে তুলে ধরতে হবে দেশকে, দেশের প্রকৃতিকে। সরাসরি বললে হয়তো আকর্ষণীয় হবে না। তাই রহস্য-রোমাঞ্চের মিশেল দিয়ে, রোমাঞ্চকর অভিযানের পটভূমিতে লিখে সেই স্বাদকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি। পাঁচজন দুঃসাহসী কিশোর যেমন অনায়াসে জড়িয়ে যায় নানা রহস্যে তেমনি দেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তারা পরিচয় দেয় কৌতূহলী মনের। আমি চেয়েছি আমাদের কিশোররা স্বদেশের শেকড় খোঁজার অনুসন্ধান করুক।

আলী ইমাম

১ লাল নিশানা

মাথার উপরে কয়েকটা গাঙচিল পাক খেয়ে উড়ছে। দুপুরের রোদে ঝিমঝিম করছে চারদিক। যতোদূর চোখ যায় ধূ ধূ করছে নীল সমুদ্র। মাছধরার অন্য নৌকাগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঢেউতে ভেসে ভেসে এই নৌকাটি এতোদূর চলে এসেছে। জেলেপাড়ার ডানপিটে কিশোর ছেলে মন্তা নৌকাতে বসা। তাকে জেলেপাড়ার অন্য ছেলেদের চাইতে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। কারণ মন্তার চোখ দুটো নীল।

দুরন্ত সমুদ্রে একাকী যেতে তার কোন ভয় নেই। ছোটবেলা থেকেই সমুদ্রের ডাক শুনে আসছে। কেমন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওদের জেলেপাড়া থেকে সারা দিন রাত সমুদ্রের একটানা কলোকলো ধ্বনি শোনা যায়। পাতার ঝুপড়িতে শুয়ে মন্তার মনে হয়েছে দাদী বুড়ির গল্পের কথা। পানির নিচে রয়েছে বিশাল প্রবাল পুরী। সেখানে ঝিনুক কুমারী সোনার

কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়ায়। যখন জাল ফেলে টেনে তোলে রাশি রাশি লাক্কা, ভেটকি কিংবা রূপচাঁদা তখন মন্তা ভাবে কোথায় সেই প্রবাল পুরীতে নেমে যাবার সিঁড়ি। সমুদ্রের পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঝিমঝিম করে।

নাঃ আশেপাশে কোন নৌকা নেই। দমকা একটা বাতাস যেন তাকে ঠেলে ঠেলে এদিকে নিয়ে এসেছে। মাথার উপরে কয়েকটা গাঙচিল। হঠাৎ মন্তার মনে হলো পানির নিচে একটা খয়েরি ঝিলিক। ভুঁস করে একটা শব্দ। বিশাল একটা মাছ শরীর দেখিয়ে ভেসে উঠলো। দুপুরের সোনালি রোদ লেগে ঝকঝক করছে।

আরে বাস, কি বিরাট মাছ! তিমির বাচ্চা নাকি। মন্তার শরীরের ভেতর একটা বুনো শক্তি যেন এসে ভর করলো। তার নৌকাতে একটা ধারালো কোচ রয়েছে। কোচের সাথে শক্ত দড়ি বাধা। সাঁই করে বিশাল মাছটা ঘুরে আসছে। মন্তার হঠাৎ মনে হলো মাছটা বুঝি দুটো লাল চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। আগুনের ভাটার মতো জ্বলজ্বল করছে সেই দুটো চোখ। বুকটা দুরদুর করে উঠলো। এমনতো কখনো মনে হয়নি। ঘাড়ের কাছে কে যেন হাত রেখেছে। চমকে তাকায় মন্তা। না, কেউ নেই। একটা গাঙচিল শুধু গোত্তা মেরে উড়ে গেল। কোচটা এক হাতে ধরে উঠে দাঁড়ালো। এই মাছটি তার নৌকা উল্টে দেবে। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে মাছটা। তীরের মতো পানি ছুঁড়ছে উপরের দিকে।

মাছটা আবার এগিয়ে আসলেই ছুঁড়ে মারবে কোচ। ধারালো ফলায় গেঁথে ফেলবে। তারপর শুরু হবে দুরন্ত এক লড়াই। হঠাৎ ভুস করে ডুব দিলো মাছটা। আর দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তা। ইস, মস্ত শিকারটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল। আজ এটাকে মেরে গাঁয়ে নিয়ে যেতে পারলে বিরাট এক ভোজ হতো। সবাই কেটেকুটে খেত। রাতের বেলায় আগুন জ্বালিয়ে উৎসব হতো। মাছপোড়া লেবুর রসে মেখে খেতে খুব মজা।

ঠিক সেই সময় বংগোপসাগরের বুকে একটি মাছধরার থাই ট্রলার ভট্ ভট্ করে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রলারের একটি ঘরে তখন শুরু হয়েছে এক রহস্যময় অনুষ্ঠান। ঘরটিতে আবছা অন্ধকার। পচা ফলের এবং মাছের আঁশটে গন্ধে বাতাস ভারী। একটি লম্বা লোক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটি খাঁচার দিকে। সেই খাঁচার ভেতরে একটি সবুজ কাক। আকারে দাঁড় কাকের চাইতে বড়। লোকটি বিদেশি। পুর্তগালের লিসবনের উপকণ্ঠে বাড়ি। নাম বেনিত্তা। ডান গালে গভীর কাটা দাগ। অন্ধকারে লোকটির চোখদুটো সীয়ামীজ বেড়ালের মতো জ্বলে। বেনিত্তার বাঁ হাতটি অস্বাভাবিক। কোন আঙুল নেই। হাঁসের পায়ের পাতার মতো চামড়ার জোড়া লাগানো। তার কতোদিনের ইচ্ছে এই বংগোপসাগরে আসা। থাই ট্রলারে চেপে লুকিয়ে এসেছে সে। এ ধরনের বেশ কিছু ট্রলার গোপনে এসে সমুদ্র থেকে মাছ চুরি করে

নিয়ে যায়। বিশেষ করে চিংড়ি মাছ। বংগোপসাগরের বাগদা চিংড়ির খুব সুনাম রয়েছে বিদেশের বাজারে। থাই মাছদস্যুরা তাই দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমা আইনের কোন তোয়াক্কা না করে ঢুকে পড়ছে মাছের উর্বর ঘাঁটিতে। বেনিত্তা এমনি একটি দলের সাথে যোগাযোগ করে এসেছে। সমুদ্র উপকুলে নেমে যাবে সে। তাঁর কাছে রয়েছে রহস্যময় এক পুঁথি। সেখানে বলা হয়েছে বেংঘোলা নামের এক দেশের কথা। যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষেরা একদা বাণিজ্য করতে এসেছিল। তাদের অনেকেই ছিল জলদস্যু। পাইরেটস। কক্সবাজারের কাছে হিমছড়িতে রয়েছে প্রাচীন এক দুর্গ বাড়ি। সেখানে বেনিত্তার পূর্বপুরুষেরা বাস করতো। সেই দুর্গ বাড়িটি এখন ঢেকে আছে আগাছায়। বুনো ঝোপে আর কাটালতায়। একটি রহস্যময় নির্দেশ পেয়ে এখানে এসেছে বেনিত্তা। অনেক কষ্ট করে এতোটা পথ এসেছে। বেনিত্তার গলায় বিচিত্র রংয়ের পাথরের মালা। তাকে দেখতে অনেকটা জিপসীদের মতো দেখায়।

সাথের খাঁচাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে। সবুজ কাকটা ছটফট করছে। বেনিত্তা পকেট থেকে একটি নীলাভ পাথরের বল বের করে। সেটা থেকে কেমন এক ধরনের চাপা আলো বিচ্ছুরিত হয়। সবুজ কাকটা তাকিয়ে রয়েছে সেই পাথরের বলের দিকে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। নীল

আকাশে জমছে মেঘ। হঠাৎ যেন চারপাশে ধূসর এক ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। বেনিত্তা ফিসফিস করে বললো—

: হে মহান লুসিফার, তোমার জয় হোক। আমি টেনে এনেছি একটি নীল চোখের ছেলেকে। আমাকে গন্তব্যে পৌছুঁতে হলে প্রথমে চাই লাল নিশানা। ঐ ছেলেটির রক্ত তৈরি করে দেবে সেই নিশানা। আমি তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি হে মহান লুসিফার। আমার এ অপেক্ষা দীর্ঘ দিনের। তিতিরের কাঁচা কলজের দোহাই। বলগা হরিণের পিত্তের দোহাই।

সবুজ কাকটা তখন তিনবার ঝাপটে উঠলো। বেনিত্তার মুখে চাপা আনন্দ ছড়িয়ে যায়। পরপর তিনবার। সব মিলে যাচ্ছে।

ওর মনে হয় লিসবনের শহরতলীর নির্জন কবরখানার দীঘল ঘাসবনের কথা। সেখানে এক বুনো ঝোপে থাকতো ধূসর বরণ নেকড়ে। সেই নেকড়েটি ছিলো শয়তানের দুত। নেকড়ের জন্যে কতোদিন নিয়ে গেছে খরগোশ। নেকড়ে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে খরগোশের শরীর।

বেনিত্তা আসলে ছিলো এক প্রেত সাধক। তাঁর সাধনার একটি অংশ ছিলো তিন বছর ধরে নিয়মিত বেজোড় শনিবারের রাতে নেকড়েটির জন্যে খরগোশ সরবরাহ করা। ঐ ঘাসবন থেকেই পেয়েছিল সবুজ কাকটি।

সময় হয়ে এসেছে। লাল নিশানা তৈরির সময়। খাঁচার

দরজাটা খুলে দিল। সবুজ কাকটা বাইরে এসে উড়ে গেলো। কাকের উড়ে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো বেনিন্তা।

মন্তা জাল টেনে তুলছে। প্রচুর লাক্কা মাছ উঠেছে এবার। কিন্তু অন্য নৌকা'গুলো কোথায় গেল। পাটাতনে জালটা রাখতেই দেখে একটা বিকট চেহারার মাছ কেমন থলথল করছে। এ ধরনের বিড়ালমুখো মাছ আগে আর দেখেনি সে। মাছটা কেমন ফ্যাঁস করে উঠলো। মন্তা একটু আনমনা হতেই সে মাছটা গড়িয়ে এসে ধারালো কাটা বিঁধিয়ে দিলো মন্তার বাম গোড়ালিতে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো মন্তা। ইস, মাছতো নয়, খুদে শয়তান একটা। কোচটা তুলে সোজা বসিয়ে দিলো সেই বিকট চেহারার মাছটার থলথলে শরীরে। কিছুক্ষণ ছটফট করলো মাছটা। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। একটা চোখ গলে বাইরে এসে ঝুলছে। সেই চোখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো মন্তার। তার সমস্ত শিরা উপশিরার ভেতরে যেন আলোর ফুলকি নেচে নেচে যাচ্ছে। মন্তা যেন দেখতে পাচ্ছে জলিঘাসের বন ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের ডিঙ্গি। ছোটবেলায় সে গলুই এর কাছে বসে থাকতো। পেট পুরে লাল ফেনসা ভাত খেয়ে যাচ্ছে মাছ ধরতে। সাগর দ্বীপে। নতুন চরে। কতো নাম। চর বগী। মায়া

পাতা। কাঁকড়ার চর। কুয়াশার ভেতরে যেন ডুবে রয়েছে চরগুলো। বালি খুঁড়ে বের করে এনেছে কাছিমের ডিম। অনেক মাছ নিয়ে ফিরছে তারা। মা পাতার ঝুপড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের করুণ মুখটাকে সে দেখতে পাচ্ছে মাছের বেরিয়ে আসা ঐ টলটলে চোখের ভেতরে।

আর তখুনি দেখা গেল সবুজ কাকটিকে ছুটে আসতে। মন্তার মাথার উপরে এসে গেছে কাকটা। গোত্তা মেরে নেমে এলো। মন্তা প্রথমে ভেবেছিল বুঝি গাঙচিল। কিন্তু কাকটা সোজা তীব্র ভাবে নেমে মন্তার মাথায় এক ঠোকর দিলো। চমকে উঠলো মন্তা। এ কেমন ভয়ংকর পাখি। প্রচণ্ড এক ব্যাথার স্রোত ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। মাথায় হাত দিতেই দেখে রক্তে সপসপ করছে। আবার নেমে এলো পাখিটা। ডানা দিয়ে বাড়ি মারলো মন্তার চোখে মুখে। সে আঘাতে নৌকার উপর পড়ে গেল। এবার ভয় পেয়ে গেল মন্তা। এমন করে তো কোন পাখি ঝাপটা মারে না। কোচটা তোলার চেষ্টা করলো। তার আগেই বাঁ চোখের উপর প্রচণ্ড ঠোকর। চোখটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। মন্তার সামনে থেকে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে।

সবুজ কাকটা ক্রমাগত ঠোকরাতে লাগলো মন্তাকে। ওর সমস্ত শরীর বুঝি ফালা ফালা করে দেবে। নোনা পানির ঝাপটা এসে লাগছে শরীরে। বাড়ছে জ্বলুনি। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসলো মন্তা। তাঁর নীল মনির চোখ দুটো

থুবলে তুলে নিলো সবুজ কাক। মস্তার মৃতদেহ নৌকার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। চোখের জায়গায় দুটো গর্ত। লাল রক্তের একটি ধারা নেমে গেছে পানিতে।

ট্রলারের ভেতরে নীলাভ পাথরের বলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো বেনিত্তা। বলের কোণায় দেখা গেল একটা লাল ফোটা ঘন হচ্ছে। বেনিত্তার চোখে মুখে চাপা উল্লাস ছড়িয়ে গেল। লাল নিশানার খবর পেয়েছে সে। এবার পথ চিনতে পারবে। সবুজ কাকটি উড়ে এসেছে। বেনিত্তা ট্রলার থেকে একটি রাবার বোট নামিয়ে নিলো। ট্রলারের থাই ক্রুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই বোটে উঠে বসলো বেনিত্তা।

তার সাথে একটি ঝুলি। খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে সবুজ কাকটি ঢুকে গেল। কাকের ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে।

বেনিত্তার রাবারের ডিঙ্গি বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। গলায় ঝোলানো তাবিজটি হাত দিয়ে ধরে। কালো টিট্টিভ পাখির কলজে আর চোখ পুরে বানানো হয়েছে এই তাবিজ। প্রেত সাধকরা এ ধরনের তাবিজ ব্যবহার করে। বাইনো-কুলারটা চোখে দিতেই মস্তার ডিঙ্গি নৌকাটি চোখে পড়ে। নীল চোখের ছেলের লাশ চিৎ হয়ে আছে। বেনিত্তার বোট এক সময় এসে লাগে সেই ডিঙ্গির কাছে। লাশটি দেখে তার চোয়াল শক্ত হয়। ঝুলি থেকে একটি ছোট ছুরি বের করে। ছুরির বাটটি মৃত মানুষের হাড় দিয়ে তৈরী।

কয়েকটা গাঙচিল উড়ছে মাথার উপর। বেনিত্তা নিপুণ ভাবে মন্তার ডান হাতের তিনটি আঙুল কেটে নিয়ে একটি সেলোফেনের প্যাকেটে রাখে। কবরখানার অনুষ্ঠানে এর প্রয়োজন হবে।

দুর্গবাড়ির কবরখানার সেই রহস্যময় অনুষ্ঠানের জন্যে এতো-দূর থেকে ছুটে এসেছে বেনিত্তা। মৃত আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হলে এ ধরনের আরো ত্রিশটি আঙুল প্রয়োজন।

মন্তার লাশের ডান হাতের বাকি আঙুলগুলো উপকূলের যেদিকে নির্দেশ করে আছে সেদিকে ডিঙ্গি বাইতে লাগলো বেনিত্তা। এটাই হচ্ছে লাল নিশানা।

২ শয়তানের আস্তানা

মাছ ধরার বাকি নৌকাগুলো তখন দূর সমুদ্র থেকে ফিরে আসছে। প্রচুর লাক্কা মাছ পাওয়া গেছে এবার। শেষ বিকেলের আলোতে কেমন মায়াবী দেখাচ্ছে সমুদ্রকে। জেলেদের সর্দার রুইদাসের একটাই চিন্তা। ডিঙির বহরে মস্তা ছিলো না। কোথায় যে ছিটকে গেল ছেলেটা। অনেক সময়ে হিংস্র কামটের আক্রমণ হয়। কামটে আবার টেনে নিয়ে গেল নাতো?

ছেলেটা বেশ সাহসী ছিল। বিশাল একটি ভেটকি মাছ ধরেছিল একবার। এতো বড়ো ভেটকি ওরা আগে আর দেখেনি। সেই মাছের কি তেলতেলে মাংশ। মাছটা ওরা তখন বিক্রি করেনি। নিজেরাই কেটে খেয়েছিলো। স্বাদ ছিলো বটে।

পাশের ডিঙ্গি থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলে, ঐ যে, ঐ যে কার নাও দেখা যায়। সবাই তাকিয়ে দেখে একটা খালি ডিঙ্গি

দূরে দুলছে। কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। বুকটা ধক করে ওঠে রুইদাশের।

ঐটা মন্তার নাও মনে হয়।

তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতে থাকে জেলেদের নৌকাগুলো। ডিঙ্গিটার কাছে যেতেই সবাই আঁতকে ওঠে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মন্তা। মুখটাকে কেমন বীভৎস দেখাচ্ছে।

রুইদাস ফ্যাসফ্যাসে গলায় চিৎকার করে ওঠে—

: মন্তারে এমন কইরা মারলো কে?

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখে মন্তার চোখ দুটোর জায়গায় গর্ত। কেউ যেন চোখ তুলে নিয়ে গেছে।

: দেও, সমুদ্রের দেও এর কাণ্ড। অমঙ্গল লাগছে। বিড়বিড় করে বলে গগন জেলে।

বুড়ো জেলের চোখে চাপা আতংক। এ ধরনের বিকৃত লাশ ছোটবেলায় দুর্গবাড়িতে দেখেছে।

: ছোট বেলায় এই রকম কতা শুনছিলাম।

: কি কতা?

: চোখ ছাড়া লাশের কতা। হিমছড়ির শয়তানের আস্তানায় ঐ রকম লাশ পাওয়া যাইতো।

হিমছড়ির নিরিবিলি ঝাউ বনের ভেতরে রয়েছে প্রাচীন এক দুর্গবাড়ি। হার্মাদদের ঘাঁটি ছিলো সেটা। লোকে এখন বলে শয়তানের আস্তানা। অনেক রহস্য সেই বাড়িটি নিয়ে।

গভীর রাতে কখনো সেই বাড়ি থেকে আর্ত চিৎকার শোনা যায়। কেউ সেখানে যেতে চায় না।
দুর্গবাড়ির পেছনের কবরখানায় লম্বা ঘাসের বন। বাতাসে সরসর করে দোলে। মাঝে মাঝে পাথরে পর্তুগীজ ভাষায় মৃতদেহের নাম লেখা। কোন কোন অমাবস্যার রাতে সেই কবরখানা থেকে শোনা যায় চাপা কান্নার শব্দ। কখনো বুনো ঝোপের ভেতরে দেখা যায় লাল রক্তের ধারা।

: শোন তোমরা। এই লাশ গাঁয়ে নিয়া কাম নাই। পিশাচ অইয়া ফিরা আইবো। এর লক্ষণ ভালো না। ছোট বেলায় এমন আমি দেখছি। তার চাইতে গাঙে ডুবাইয়া দাও।

জেলেরা তাই করে। মন্তার লাশের গলায় ভারী বস্তা বেধে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়। টুপ করে ডুবে যায় লাশটা।
জেলেপাড়ার নীল চোখের ছেলেটি ডুবে যায়।
মন্তা কখনো ভাবতো কেমন করে যাবে দাদী বুড়ির গল্পে শোনা সেই প্রবাল পুরীতে। ঝিনুক কুমারীর কাছে। কোথায় সেই সিঁড়ি। মন্তার লাশটা ডুবে যেতে থাকে অতলে।
মাথার উপর দিয়ে সজন পাখিদের একটি ঝাঁক কোয়াক কোয়াক করে ডেকে যায়। শেষ বিকেলের যাই যাই রোদ ওদের ডানায় মিশে থাকে। দৃশ্যটা খুব সুন্দর। রুইদাশ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বিষণ্ন মুখে জেলেরা ফিরে আসছে। গগন বুড়োর মাথায় শাদা শনের মতো চুল। বুড়ো মাথা গুঁজে বসে আছে।

: মনে হয় ঘোর অমঙ্গল লাগবো।

: কেন?

: ছোটবেলায় শয়তানের আস্তানা ঐ দুর্গবাড়িতে এমন একটা লাশ দেখছিলাম। চক্ষু দুইডা যেন খুবলাইয়া নিয়া গেছে। তারপর সারা গেরামের কি কাণ্ড। সন্ধ্যার পর কেউ আর বাইর অইতে সাহস পায় না। কয়, কানা শয়তান ঘুরতাছে।

: আমিও শুনতাম। কানা শয়তান কচি শিশুদের ধইরা নিয়া যায়। রক্ত চুইষা খায়। কখনো কুচকুচে কালা কুকুরের রূপ ধইরা আসে।

রুইদাশের গলায় চাপা আতঙ্ক।

: দেইখো, আমার মনে অইতাছে ঐ দুর্গবাড়িতে একটা কিছু আজ ঘটবো।

দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ জমে উঠলো। চারপাশ নিমেষেই কাকের ডানার মতো কালো হয়ে এলো। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। জেলে ডিঙ্গিগুলো তীরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সমুদ্র ফুলে উঠছে। উথাল পাতাল ঢেউ। একবার গর্জে উঠলো আকাশ। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি। শান্ত সমুদ্র এখন দাপাদাপি করছে। একটি নৌকা ঘুরপাক খেতে লাগলো।

ঘূর্ণিতে পড়লে যেমন হয়। চিৎকার করছে রুইদাশ। বাতাসের ভেতরে তার সে শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চাপা গোঙানির মতো মনে হচ্ছে। নৌকাটি ঘুরপাক খেতে খেতেই জোয়ান ছেলেটি ছিটকে পড়লো। সবাই দেখলো সমুদ্রের নিচ থেকে একটা শাদা লেজের মতো কি যেন বাড়ি দিয়ে ফেলে দিলো তাকে।

গগন বুড়ো বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

ঃ সাগর দেও উঠে আসছে। সাবধান।

তীরের ফলার মতো বৃষ্টির ছাট। বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে কখনো। অশান্ত সমুদ্রে ঝড়ের ভেতরে লড়াই করছে কয়েক জন জেলে। বেনিত্তার রাবার বোটটি তখন উপকূলে এসে ভিড়লো। প্রবল বাতাসের ঝাপটায় বেনিত্তার কালো আলখাল্লা ফুলে উঠেছে। বিশাল উট পাখির ডানার মতো দেখাচ্ছে হাত দুটো। চোখে মুখে বৃষ্টির ধারা এসে লাগছে। আবছা অন্ধকারে তাঁর চোখ সীয়ামিজ বেড়ালের মতো জ্বলছে। হিমছড়ির ঝাউবন বাতাসে সোঁ সোঁ করছে।

বেনিত্তার পূর্বপুরুষরা এসেছিল পর্তগাল থেকে এই বেংগোলাতে। তারা ছিলো হার্মাদ। সমুদ্রের আতঙ্ক নিষ্ঠুর জলদস্যু। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত আর বুনো স্বভাবের মানুষগুলো।

তাদের বংশে রয়েছে এক প্রাচীন পুথি। সেখানে রয়েছে সতের শতকের এক দুঃসাহসী নাবিক সিষ্টান বাতিস্তার কথা। অনেক লোমহর্ষক ঘটনার নায়ক সে। ক্যাপ্টেন কিডের সাথে বন্ধুত্ব ছিলো। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট্ট দ্বীপের

অজানা জায়গায় প্রায় শখানেক জাহাজের লুণ্ঠিত সম্পদ সে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। ১৭০১ সালের ৮ ই মে সমুদ্রের আতঙ্ক উইলিয়াম কিডের ফাঁসি হয়েছিল। তার কাছে গুপ্তধনের যে আধখানা নকশা ছিল আজ পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ক্যাপ্টেন কিডের লুণ্ঠিত ধনরত্ন বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কোন একটি দ্বীপে আজও লোকচক্ষুর আড়ালে অক্ষত অবস্থায় আছে। পাহাড় আর গুহা সমৃদ্ধ দ্বীপ, আর একটা গাছ। বছরের কোনও একটা দিনে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে সূর্য যখন গাছের ওপর কিরণ বর্ষণ করে তখন তার ছায়া আড়াআড়ি-ভাবে একটা গুহার মুখে এসে পড়ে। এসব কথাই বেনিস্তা জেনেছে সেই পুথি থেকে। সিষ্টান বাতিস্তা ছিলো একজন প্রেত সাধক। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় হিমছড়ির দুর্গে। এখানেই কবর দেয়া হয় তাকে। এতোদিন পর নতুন নির্দেশ পেয়ে তার খোঁজে এসেছে উত্তরপুরুষ বেনিস্তা।

ঝাউবনের ভেতর দিয়ে ঝুলিটি নিয়ে হাঁটতে লাগলো বেনিস্তা। ঝাউশাখা দুলছে। যেন ফিসফিস করে বলছে,

: এসো এসো সিস্টান বাতিস্তার বংশধর। আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার পূর্বপুরুষেরা এখান দিয়ে যেত।

কথাটা ভাবতেই বেনিস্তার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠলো। সে যেন দেখলো পালতোলা জাহাজ থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্ন বোঝাই বাক্স নামাচ্ছে বাতিস্তা। ঈগলের মতো খাড়া নাক। হাতে খোলা তলোয়ার।

পথে কোথাও লোকজন নেই।

খাঁচার ভেতরে সবুজ কাক ছটফট করছে। খাঁচা খুলে দিল বেনিত্তা। এখন এই কাকটিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কাকটা খানিক উড়ে, খানিক লাফিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বিদ্যুৎতের আলোতে বেনিত্তা দেখলো সে একটি আগাছায় ঘেরা প্রাচীন বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সবুজ কাকটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো। এটাই তাহলে সেই দুর্গ। বেনিত্তা ফটকের দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিলো। ভারী কাঠের দরজা। আড়াআড়িভাবে তাতে লোহার পাত বসানো। জং ধরে গেছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজা। বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সামনে ছোট উঠোন। বুনো-ঝোপে ছেয়ে আছে। সাপ থাকে। বাঁদিকে লোহার একটি ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। কয়েকটা শেয়াল বেনিত্তাকে দেখে পালালো। লোকে এটাকে বলে শয়তানের আস্তানা। ঘরগুলো খালি। কেউ থাকে না।

ঝড়ো বাতাসে জানালার কবাট বাড়ি খাচ্ছে। একটা বড় ঘরের ভেতরে ঢোকে বেনিত্তা। এখানটিতেই আস্তানা পাতবে। ঝুলি থেকে একটি ছোট বাতি বের করে জ্বালে। দেয়ালে বিরাট করে ছায়া ওঠে লাফিয়ে। সবুজ কাকটা এক পাশে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুলি থেকে শুকনো খাবার বের করে বেনিত্তা। তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

দীর্ঘদিন পর হার্মাদদের এই পরিত্যাক্ত দুর্গবাড়ির একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠলো।

৩ প্রেত সাধকের ডাইরি

বৃষ্টির বেগ একটু কমে এসেছে। ঘরের দেয়ালে একটা বন গরুর বিশাল খুলি ঝোলানো। সেই খুলির চোখের গর্তের ভেতর দিয়ে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। বাতির আলোতে বেনিত্তা দেখলো কড়ি কাঠের কাছে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। মস্ত এক খুঁড়ুলে পেঁচা পালক ফুলিয়ে তাকে দেখছে। অবশেষে সে এখন হিমছড়ির দুর্গ বাড়িতে। পুথিতে লেখা বেংঘোলা দেশে। এখানটায় আসতে কম ধকল যায়নি। থাই ট্রলারের লোকগুলো তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ওদের সাথে যোগাযোগ ব্যাংককের এক রেঁস্তোরায়। দামী কিছু পাথরের বিনিময়ে ওরা রাজী হয় তাকে বংগোপসাগরে নিয়ে আসতে। পুথিতে লেখা ছিল কোন পথ দিয়ে আসতে হবে। ওর পূর্বপুরুষেরা যেভাবে এসেছিল এই শ্যামল উর্বর দেশে। সে ভাবেই আসতে হবে। লিসবনের রাস্তায় কতোদিন হেঁটে যেতে যেতে বেনিত্তা স্বপ্ন দেখেছে মিস্তান বাতিস্তার গুপ্তধনের। সবাই শুনেছে বাতিস্তা ক্যাপ্টেন কিডের মতোই প্রচুর ধন সম্পতি জমিয়েছিল। নীল দরিয়ার আতংক ছিল

বাতিস্তা। সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে একটি দ্বীপে। একবার হঠাৎ করে তার মাঝে পরিবর্তন আসে। সব ছেড়ে ছুড়ে কালো জাদুর চর্চা শুরু করে। তখন অনেকেই এই রহস্যময় বিষয়টির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সিস্তান বাতিস্তা ধীরে ধীরে একজন প্রেত সাধক হয়ে যায়। তাঁর ডাইরীতে লেখা আছে—
: আমি অন্য কিছু অনুভব করতে পারছি। গাছের ডালে যে পাখিটি উড়ে এসে বসে আমি তার বুকের ভেতরের লাল মাংশ স্পষ্ট দেখতে পাই। থরথর করে কাঁপছে কলজে। এই পাখি অনেক অরন্যের খবর জানে। আমি কশুর শকুনের মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী হতে চাই। যাতে অনেক দূরের জিনিশও ভালোভাবে দেখতে পারি। এই পৃথিবীতে অনেক গুপ্তবিদ্যা রয়েছে। আমরা তার কোন কিছুই জানি না। আমাদের এই মূর্খতার অবসান ঘটাতে হবে। পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময়কে আবিস্কার করতে হবে।

এই পরিবর্তনের পর থেকে বাতিস্তা বাইরের পৃথিবীর লোক-জনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতো না। দুর্গ বাড়ির এক ঘরে বসে শয়তানের উপাসনা করতো। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল বাতিস্তা। অদ্ভুত এক সাধনা ছিলো তাঁর। নীল চোখের কিশোর ছেলেদের ধরে এনে হত্যা করে তাদের তাজা রক্তে স্নান করতো এই পিশাচ সাধক। এই ধারনা সে পেয়েছিল ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী এক হাংগেরীয় কাউন্টেস এলিজাবেথ বাথোরীর কাছ থেকে। যে ছিলো ভয়ানক নিষ্ঠুর

এক মহিলা। কিশোর কিশোরীদের তাজা রক্তে স্নান করতো। ১৬১০ সালে তার দুর্গের ভেতরে পঞ্চাশটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কাউন্টেস তার স্বামীকে একবার লিখেছিলেন,— থোরকো আমাকে এক নতুন বিষয়ে জ্ঞান দান করলো। তোমার শত্রুকে যদি তুমি পরাজিত করতে চাও তাহলে একটা কালো মুরগীকে শাদা ছুরি দিয়ে হত্যা করে তার রক্ত শত্রুর উপরে ছিটিয়ে দাও।

হিমছড়ির ঝাউবন থেকে বৃষ্টিভেজা বাতাস ছুটে আসছে। দুর্গবাড়ির অলিন্দে অলিন্দে যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো সেই বাতাস গুমড়ে উঠছে। কতো নীল চোখের কিশোর ছেলেকে এখানে ধরে এনে এক সময় হত্যা করা হয়েছে। তাদের চাপা আর্তনাদ মিশে আছে এ বাড়ির প্রতিটি ইটের খাঁজে। দেয়ালের ভেতরে। গোপন কুঠুরীতে। আজকের ঝড়ো রাতে যেন অতীতের সমস্ত গোঙানি দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ঝুলি থেকে নীল হরিনের একটি ছাল বের করে বেনিত্তা। তুন্দ্রা অঞ্চলের এক জিপসি তাকে এ ছালটি দিয়েছিল। দুর্গম তুন্দ্রা অঞ্চলে কখনো কখনো এই দুষ্প্রাপ্য নীল হরিণদের দেখতে পাওয়া যায়। শাদা বরফের দেশে চকিতে দেখা যায় এই রহস্যময় প্রানীদের। একটা নীল ঝিলিক তুলেই সাঁৎ করে মিলিয়ে যায়। প্রেত সাধকদের জন্যে এ ধরনের ছাল খুব প্রয়োজনীয়। নেকড়ের লেজের লোমপুড়িয়ে তৈরী তাবিজ

হাতের মুঠোতে রেখে সেই ছালে বসে প্রেত সাধনা করতে হয়। সিস্তান বাতিস্তাও ছিলো এক প্রেত সাধক। তাঁর ডাইরীর খোঁজে এখানে এসেছে সে। বেনিস্তা বিশ্বাস করে সেই ডাইরীতে রয়েছে গুপ্ত ধনের সন্ধান।

লিসবনের এক পোড়োবাড়িতে ছিলো কয়েকজন প্রেত সাধকের ঘাঁটি। তারা সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে শয়তানের উপাসনা করতো। বিভিন্ন রকমের রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রতি ওদের প্রবল ঝোঁক ছিল। কেমন করে পাখির ভাষা বুঝতে পারা যায়। তারা বিশ্বাস করতো ২৮ শে অক্টোবর দু'জন সাথী সহ বনে গিয়ে প্রথম যে পাখি বা জন্তু চোখে পড়বে সেটাকে মারতে হবে। তারপর শেয়ালের হৃৎপিণ্ডের সাথে একত্রে পাক করে সেই মাংস খেলেই যে কোন পাখি বা পশুর ভাষা বোঝা যাবে। ছ'বছর বা তার বেশি বয়সের একটা পুরুষ হরিণের শিং গুঁড়ো করে গরুর পিত্তের সাথে ভালো করে মিশিয়ে সব সময় কাছে রাখতো।

হরিণের ছালে বসে নীলাভ পাথরের বলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেনিস্তা। কয়েকটা রেখা আঁকিবুকির মতো ফুটে উঠছে। সে যেন সেখানে দেখতে পাচ্ছে সিস্তান বাতিস্তার মুখ। কড়ি কাঠের ফোকর থেকে পেঁচা ডেকে ওঠে। সবুজ কাকটা ডানা ঝাপটা দেয়। বেনিস্তা ঝুলি থেকে কয়েক গোছা শিকড় বের করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তীব্র গন্ধে এবং

ধোঁয়ায় ঘরটি ভরে যায়। বেনিতা একাগ্র মনে ডাকতে থাকে লুসিফারকে।

: বেনিতা, তোমার জন্যে কবরের ভেতরে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি। আমাকে জাগিয়ে তোল তুমি। আমার জন্যে আরো দশটি নীল চোখের ছেলের চোখ প্রয়োজন। আরো ত্রিশটি আঙ্গুল প্রয়োজন। প্রথম শিকার তোমার সঠিক হয়েছে। আমাকে মুক্তি দাও এই নিকষ অন্ধকার থেকে। আমি তখন তোমাকে গুপ্তধনের সন্ধান দেব।'

বেনিতা ঘোরের মধ্যে এসব শুনতে পায়। যেন অনেক দূর থেকে এসব কেউ ফিস ফিস করে বলছে। প্রেত সাধক বাতিস্তার ডাইরিটি যে করেই হোক পেতে হবে।

৪ প্রবাল দ্বীপ

জীপটা বা দিকে ঘুরতেই চোখের সামনে ঝিলমিল করে উঠলো নাফ নদী। দূরে বার্মার পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দুপাশে গাছপালার ঠাসবুনোট। তকি বাইনোকুলার দিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। কয়েকটা বানর কিচ কিচ করে লাফিয়ে চলে গেল।

: এগুলোকে বলে প্যারাইলা বানর। কাঁকড়া ধরে খায়। ইদানীং দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসছে। নাফ নদীর কাছের বনেই যা দেখা যায়।

দলের মধ্যে তকি পশু পাখির ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। মেলা খোঁজ খবর রাখে। নিজে 'পাখি দেখার ক্লাব'এর সদস্য। 'ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি' পত্রিকাটির নিয়মিত গ্রাহক।

: কই, কাঁকড়া খেকো বানর কোথায়? আমি কখনো দেখিনি। লিপন দু'পাশের গাছপালার দিকে তাকায়।

: একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তো হয়। এতো কষ্ট করে বনে পাহাড়ে ছুটতে হবে না।

পেছন থেকে চিইং গাম চিবুতে চিবুতে ফোড়ন কাটে আশরাফ।

: তার মানে আমি একটা বাঁদর। আয়নায় নিজের চেহারা দেখবো। আমার সাথে ইয়ার্কি। এক ঘুষিতে পাঠিয়ে দেব বার্মার ঐ মংডু পাহাড়ে।

জীপটা সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে টেকনাফের দিকে। ড্রাইভার ছাড়া পাঁচজন রয়েছে। তকি, আকরাম, লিপন, আশরাফ ও ফয়সাল। সবার ঝোঁক এ্যাডভেঞ্চারের দিকে। রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী পেলেই পড়ে। ওরা পাঁচজনে মিলে একটা দল তৈরি করেছে। দলনেতা ফয়সাল। জুডোতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া। প্রায়ই বলে—

: আমাদের এই একঘেঁয়ে জীবনেও ইচ্ছে করলে রোমাঞ্চের স্বাদ ছড়িয়ে দেয়া যায়। আমাদের দেশেই কতো সব বিচিত্র দেখার জায়গা রয়েছে। ক'জন তার খবর রাখি। আমরা সেখানে যেতে চাই। পথ যতোই দুর্গম হোক। নতুন কিছু দেখবো। হয়তো কোথাও গিয়ে হঠাৎ করে দারুন কোন রহস্যের মুখোমুখি হতে পারি।

ফয়সালের অনেকদিনের পরিকল্পনা ছিলো সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে যাওয়ার। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এবার সবাই দলবেঁধে চলেছে। নিজেদের দেশের কতো কিছুই যে দেখা হয়নি!

একপাশে নাফ নদী। দূরে আবছা কুয়াশার মতো বার্মার পাহাড়। গাছে উজ্জ্বল বুনো ফুল। একঝাঁক পাখি উড়ে যায়। কয়েকজন মগ চলে গেল লবনের ভার নিয়ে।

বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চলছে জীপ। কোথাও বাবলার ঝোপ।

: এখন যদি কোথাও ক্যাকটাস ফুটে থাকতো তাহলে মনে হতো আরিজোনার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি।

আকরাম উল্লাসে চেঁচিয়ে বলে।

: আর বুনো ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে দুঃসাহসী কাউ বয়রা। এসেই ঢিসুম ঢিসুম।

মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে লিপন।

: কিংবা ছুঁড়ে মারতো দড়ির ফাঁদ ল্যাসো।

লাফিয়ে একবার উঠলো জীপটা। লিপন জাপটে ধরে তকিকে। একসময় টেকনাফের নৈকত দেখা যায়। ঝকঝক করছে নীল সমুদ্র। সীগাল উড়ছে।

: আঃ কি ঘন নীল। চোখ জুড়িয়ে গেল। কেউ যেন দোয়াতের কালি ঢেলে দিয়েছে।

তীরে লোকজন বেশি নেই। কয়েকজন ছেলে রোদে জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা ছুটোছুটি করতে থাকে। ঝিনুক তোলে। লাল কাঁকড়াগুলো তিরতির করে পালায়। ফয়সাল বলে—

: আমাদের কিন্তু সেন্ট মার্টিন্স যেতে হবে। এখানে বেশিক্ষন থাকা চলবেনা। চলো।

জোয়ারের সময় টেকনাফ থেকে ইঞ্জিন চালিত নৌকা যাতায়ত করে। দ্বীপে যাবার একমাত্র বাহন। স্থানীয় লোকেরা বলে জিনজিরার চর। শুনে তকি বলে—

: আরবীতে দ্বীপকে বলে 'জাজিরা'। বোধহয় সেখান থেকেই এ নামটি এসেছে। এক সময় আরব বণিকেরা ব্যবসার জন্যে এদিকে আসতো।

: শুধু আরব বণিকরাই না। পর্তুগীজ জলদস্যুরাও আসতো। ঠিক এই সময় একটা দাঁড়কাক কোত্থেকে গোত্তা মেরে নেমে লিপনের মাথায় ঠোকর দিয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে লিপন। পাখিটা নখ দিয়ে লিপনের মুখের কিছু অংশ আঁচড়ে দেয়। তারপর উড়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই চমকে গেছে। দাঁড়কাকের এমন আক্রমন। লিপনের মুখ জ্বালা করছে। তুলোতে স্যাভলন লাগিয়ে মুছে নেয়।

: কি কাণ্ড। একেবারে বার্ডস ছবির দৃশ্য।

জোয়ার আসতে দেরী আছে। জীপে করে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে। এক পাশে প্যারাবন। সাগর কলমীর বেগুনি ফুল পানির নিচে ঝকঝক করে। নারকেল গাছ দোলে বাতাসে। বন্দর মোকামের দিকে যায় ট্রলার। একপাশে প্রচুর ঝিনুকের খোলা। সূর্যের আলোকে চকচক করছে। লবনের ভার নিয়ে আসছে কয়েকজন। ক্ষেতে এবার প্রচুর তরমুজ ফলেছে। লতাপাতার মাঝে পাখির বিশাল ডিমের মতো তরমুজ।

বন্দর মোকাম হলো শুটকি মাছের ঘাঁটি। বাতাসে মাছের গন্ধ। নৌকা বোঝাই রাশি রাশি মাছ এসে জমা হচ্ছে। অনেক লোক মাছ কাটায় ব্যস্ত। মাছের পেটের নাড়িভুঁড়ি

ফেলে লবন মাখিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে বাঁশের সাথে বাধা দড়িতে। অনেকের হাতে মাছের তাজা রক্ত। কোন বিশাল মাছের চকচকে শাদা পেট ছুরি দিয়ে একটানে চিরে ফেলছে। কয়েকটা বড় কুকুর ঘুরঘুর করছে।

টেকনাফ থেকে শাহপরি পর্যন্ত জীপ যায়। ভেড়িবাঁধে ওঠার সরু রাস্তা। বাঁধের নিচে ঘন প্যারাবন। মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে আছে গাছগুলো। বালুর মধ্যে পাতা বিছিয়ে আছে সাগরকলমী।

বন্দর মোকাম থেকে জিনজিরার চর সাত মাইল। জেলেরা গোলপাতার ঘর উঠিয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোজ ট্রলারে মাছ কুড়াতে যায়। গভীর সমুদ্র থেকে ট্রলারগুলো ফিরে এলে মাছ যখন বরফের ট্রলারে তোলে তখন এদিক সেদিক অনেক মাছ পড়ে যায়। ছেলে মেয়েরা তখন উল্লাসে জলকাদা ঘেটে মাছ তোলে। অনেকক্ষণ হাটাহাটি করে ওদের বেশ খিদে পেয়েছে। আশরাফ বাজার থেকে কলা কিনে এনেছে। ফয়সাল সবসময় নতুন চিন্তা করছে।

: বিদেশের এ ধরনের সমুদ্র সৈকতে মাছ ভাজা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সমুদ্রের বাতাসে বেশ খিদেপায়। তখন নোনা মাছ ভেজে খাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। এদেশে এসব দিকে কারো কোন নজর নেই। আজকাল অবশ্য সামুদ্রিক মাছের ফেলে দেয়া অংশগুলো দিয়ে ফিশ রোল, ফিস বল বানানো হচ্ছে। ঢাকার অনেক দোকানেও তা পাওয়া যায়।

একঝাঁক কাক উড়ে যায় নারকেল বনের দিকে। লিপন সেদিকে আতংকিত চোখে তাকায়। তার মুখের জ্বলুনি এখনো যায়নি। কি ভয়ংকর ছিলো সেই দাঁড়কাকটা। ঠোকর দিয়ে মাথার কিছুটা চামড়া ছিলে ফেলেছে!

জোয়ারের সময় এসেছে। এখানকার মানুষদের জীবন জোয়ার ভাটার সাথে বাধা। ঘাটে বেশ ভীড়। সবাই দ্বীপে যাবে। অনেকেই খাবার কিনে নিয়েছে। ওরা ইঞ্জিন চালিত নৌকায় উঠে বসে। শীতকালে রোজ এসব নৌকা যাওয়া আসা করে। সমস্যা দাঁড়ায় বর্ষাকালে। সমুদ্র তখন উত্তাল। তখন দিনের পর দিন জিনজিরার চর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

: একেবারে রবিনসন ক্রুশোর মতো অবস্থা হয়ে যায় তখন। নির্বাসিত জীবন।

: আমারতো ভাবতেই ভালো লাগছে যে আমাদের দেশেই একটা প্রবাল দ্বীপ রয়েছে। মালদ্বীপে যেতে কতো লোক ছোটে। নিজের দেশের খবর না রেখে।

ভটভট শব্দ করে নৌকা ছাড়ে। গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে নৌকা। হঠাৎ একপাশ দিয়ে সাই করে উড়ুক্কু মাছ চলে যায়। রোদে ঝলসে ওঠে ওদের শরীর। বাতাসে পাখনায় ভর করে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত উড়ে যায়।

দূর থেকে সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপকে দেখায় গোলাকার নারকেল বাগানের মতো। নীলের কোলে সবুজ সে দ্বীপ। আসলে

দ্বীপটি লম্বাটে। চারটি ছোট ছোট দ্বীপ সরু খাল দিয়ে সংযুক্ত। জোয়ারে খাল ভরে উঠলে সবগুলো তখন আলাদা হয়ে যায়।

নৌকা যতো এগিয়ে যাচ্ছে ওদের ততো উত্তেজনা বাড়ে। দ্বীপে থাকবে ওরা তাঁবু খাটিয়ে। ক'দিন অন্য রকমের জীবন কাটাবে। শহরের ভিড়, হই চই আর ধোঁয়া নেই। স্বচ্ছ নীল আকাশের নিচে মুক্ত পাখির মতো ঘুরবে। দ্বীপটিকে নিয়ে গবেষণা করবে। কতো রকমের প্রবাল হয়। ভিডিওতে তুলবে ছবি। দ্বীপের চারদিকে পানির নিচে আছে গোল আর ডিমের আকারের অসংখ্য পাথর। প্রবাল যেন পাথরের ফুল। কোন ফুল মৌমাছির চাকের মতো অজস্র ছিদ্রে ভরা। কোন ফুল মানুষের মগজের মতো।

নৌকা এসে থামে বাজারের ঘাটে। লোকে বলে জিনজিরা। বেশ কিছু ট্রলার এক পাশে। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরেছে। ট্রলারের ওপর রাশি রাশি মাছ লাফায়। জলা জায়গায় নতুন ধরনের কিছু পাখি ঘুরছে।

: তকি, বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করে দেখ। তুমিতো আবার একজন বার্ড ওয়াচার।

তকি দেখে নতুন ধরনের পাখি 'করকরি ডক'। ঠোঁটের পেছন থেকে ঘাড় পর্যন্ত বাদামি রঙ। ছাই রঙের বুক। পেট আর পাখার পাশের অংশে কালোর ওপর শাদা কালো দাগ। চোখ আর ঠোঁট লালচে। পা দুটো হালকা সবুজ রঙের।

তকির এই দ্বীপে আসার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাগর পাখিদের ষ্টাডি করা।

নৌকা থেকেই বাইনোকুলার দিয়ে দ্বীপটাকে দেখছিল তকি। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। একটি নারকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে বীভৎস চেহারার এক জন লোক। তার কাধে একটি দাঁড়কাক বসা। কোন মানুষকে এর আগে কাক পুষতে দেখেনি তকি। বাইনোকুলারের লেন্স জুম করতেই দেখে সেই কাকটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ভয়ংকর চেহারার লোকটি। এটি কি সেই কাক যে লিপনকে আক্রমণ করেছিল?

তকির ভেতরে কেমন একটা ভয়ের শিহরণ খেলে যায়।

৫ ভয়ংকর লড়াই

সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। নোনা দরিয়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। বাজারের কোনায় একটি সজনে গাছ। ডালগুলো ফুলে ভরা। হাটের লোকজন ওদের কৌতূহলী হয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে শহর থেকে ছাত্ররা এসে দ্বীপে গবেষনা করে। ঝিনুক, পাথর কুড়ায়। ছবি তোলে। প্রবাল তোলে। এরাও বোধহয় সে রকম কোন দল।

কয়েকটা কুক্কা পাখি উড়ে গেল। একপাশে কয়েকটা হাংগর ঝুলছে। এখানকার লোক হাংগরকে বলে কামট। এখন হাংগরের কলজে, পাখনা, দাঁত, মাংশ সবই বিদেশে চালান যায়। কুইচ্চা মাছ বঁড়শিতে গেথে হাংগর ধরে। লিকলিকে লাল সাপের মতো দেখতে কুইচ্চা মাছ। অনেকেই হাংগর বেঁচে প্রচুর টাকা করেছে।

ওদের মালপত্র কম না। সমুদের নিচে ডুবে কাজ করবে বলে ফ্লিপার, গ্যাসমাস্ক সাথে এনেছে। প্যারিসে এ ধরনের কিশোর ডুবুরীদের ক্লাব রয়েছে। অনেক সময় হঠাৎ করে

তারা সমুদ্রের নিচে ডুবে যাওয়া কোন প্রাচীন জাহাজের খোঁজ পেয়ে যায়। সেখানে পায় প্রাচীন আমলের কোন জিনিশ। বছর তিন আগে খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। দু'জন কিশোর ডুবুরী এক স্পেনীয় জাহাজের সন্ধান পায়। জাহাজটি এক হাজার বছর আগে ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজের খোল থেকে ওরা পুরনো আমলের কয়েকটি পাত্র খুঁজে পায়। ঐতিহাসিকেরা খুব গুরুত্ব দিয়েছিল সেসব পাত্রের। কিশোর ডুবুরী দু'জন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে বিদেশের এ ধরনের অনেক ক্লাব সমুদ্রের নিচ থেকে ঐতিহাসিক সম্পদ খুঁজে বের করার নানা কর্মসূচী নেয়। কতো জাহাজ ডুবে আছে সমুদ্রে। টাইটানিকের খোঁজে এখনো চলছে অভিযান। কুয়াশার ভেতরে বিশাল বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে গিয়েছিল টাইটানিক। প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে।

কয়েকটি ছোট ছেলে ঝুড়িতে ছোট ছোট ডিম নিয়ে যাচ্ছে। বাজারে গিয়ে বিক্রী করবে।

: স্যার, ডিম নিবেন ?

: কিসের ডিম ? পাখির ?

: না স্যার। কাছিমের।

তকি ডিমগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। রোদ লেগে চকচক করছে। ছোট পিং পং বলের মতো ডিম। তকির মনে পড়ে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের কথা। বংগোপসাগরের সবুজ কাছিম

বিরল হয়ে আসছে।

: এগুলো এধরনের দুষ্প্রাপ্য কাছিমের ডিম। আন্দামান নিকোবর দ্বীপেও এধরনের ছোট জলপাই সবুজ কাছিম দেখা যায়। কিন্তু এভাবে ডিম বেঁচতে থাকলে প্রানীটি যে খুব শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে।

রাতের বেলায় তীরে এসে বালি খুঁড়ে ডিম পেড়ে যায় সবুজ কাছিমেরা। সেই ডিম কুড়িয়ে নেয় লোভী মানুষ। বালু সরিয়ে বের করে আনে। টাকায় দশটা করে বিক্রী হয়। মগ, বর্মীজরা খায়। টেকনাফের কিছু হোটেলে চালান যায়।

: এসব ডিম বেঁচবি না।

: না বেঁচলে খামু কি?

ছেলেগুলো বাজারের দিকে চলে যায়। দ্বীপে একটাই প্রাইমারী স্কুল। সেখানেও ছাত্র নেই বেশি। দ্বীপে একটি বাতিঘর আছে।

ফয়সাল দ্বীপের একটা ম্যাপ বের করে। উত্তর পূর্ব কোনের একটা জায়গায় তাঁবু খাটাবার স্থান ঠিক করে। কয়েকজন লোক ওদের মালপত্র নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এই প্রবাল দ্বীপটির আয়তন ২ বর্গ মাইল। চারপাশ থেকেই অবিরাম সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। উদ্দাম বাতাসে নারকেল বন দোলে। পিঠে মাল বেধে হাঁটতে ওদের ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে দুর্গম কোন জায়গাতে এ্যাডভেঞ্চার করতে বুঝি যাচ্ছে। যেখানে পদে পদে ভয়। উত্তেজনা!

: কেমন লাগছে লিপন? তুমিতো আবার শহরের ফ্লাট বাড়ি পছন্দ করো।

পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতে আকরাম জিজ্ঞেস করে।

: উফ্, দারুণ। মনে হচ্ছে যেন নতুন এক পৃথিবীতে আমরা এসে গেছি। ট্রেজার আইল্যাণ্ডে বুঝি পা রাখলাম। এখন চাই সেই গুপ্তধনের সন্ধান।

মাথার উপর দিয়ে সজন পাখিদের একটি ঝাঁক উড়ে যায়। লটবহর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দলটি। আকরাম মৃদু শিস দেয়। আশরাফ গান ধরে—প্রবাল দ্বীপে নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা।

জেলেরা মাছ নিয়ে ফিরছে। দ্বীপের বেশির ভাগ লোকের আয়ের উৎস হলো মাছধরা। ঝিনুক, কড়ি, প্রবাল বেঁচেও কিছু রোজগার হয়। আর বিক্রী করে শ্যাওলা। জোয়ারের পানির সাথে ভেসে আসে প্রচুর শ্যাওলা। ভাটার টানে এগুলো সৈকতে জমা হয়। এসব শ্যাওলা কুড়ায় শিশু কিশোররা। মগরা শুকনো শ্যাওলা থেকে মজার খাবার তৈরি করতে পারে।

: আমাদেরও একদিন শ্যাওলার খাবার খেতে হবে। জাপানীরা প্রচুর শ্যাওলা খায়। সালাদ হিশেবে। ওরা বিশ জাতের সামুদ্রিক উদ্ভিদ ব্যবহার করে। সেখানে কমলা, লাল, বেগুনি, টকটকে লাল শ্যাওলা হয়। ফ্রান্সে, আমেরিকায়

ও আরো নানা দেশে লোকে এরকম প্রায় একশো জাতের উদ্ভিদ খাবার হিশেবে ব্যবহার করে।

আকরাম তথ্যগুলো জানায়।

: হবে না. কিছু হবে না। শ্যাওলা থেকে খাবার! ঢাকায় একথা শুনলে অনেকে পাগল বলবে। নতুন কিচ্ছু করতে চায় না। মাছ ধরছে সেই মান্ধাতা আমলের কায়দায়। অথচ নতুন ধরনে এখন মাছ ধরা চলছে।

: সেটা আবার কি রকম?

: কাস্পিয়ান সাগরে আজকাল পানির তলায় কড়া আলো ফেলে মাছ জড়ো করা হয়। তারপর জোরালো পাম্পের সাহায্যে সে সব মাছ নৌকায় টেনে তোলা হয়। কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে মাছকে জালে নিয়ে ফেলা হয়।

সমুদ্রের তীর দিয়ে এখন ওরা হেঁটে যাচ্ছে। দূর থেকে কাঁকড়াদের ঝাঁককে মনে হয় লাল কার্পেটের মতো। হঠাৎ সামনে দেখে সাগর শশা। দেখতে দৈত্যাকায় জোঁকের মতো। তবে একদম নিরীহ প্রাণী। পৃথিবীর অনেক দেশেই সাগর শশা থেকে চমৎকার খাবার বানানো হয়।

: কি লিপন, সাগর শশাটা তুলে নেই। তুমি তো আবার নানা রকমের বিচিত্র রান্না জানো। এটা দিয়ে স্যুপ বানালে কেমন হয়।

: চমৎকার হয়। দ্বীপে যখন এসেছি তখন খাবার নিয়ে

পরীক্ষা চালাতেই হবে। রবিনসন ক্রুশোর মতো।

সোনালি রোদে সমুদ্র ঝকঝক করছে। কয়েকটা উড়ুক্কু মাছকে ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখা যায়।

সৈকতের বালিতে পানি সরে যেতেই কয়েকটা তারামাছ দেখা যায়। তিরতির করছে। টলটলে পানির নিচে মাছের কাঁপুনি। পাঁচটি করে ডানা তারামাছের। লাল, কমলা, বাদামি রংয়ের তারামাছগুলোকে দেখতে চমৎকার লাগে।

ফয়সাল কয়েকটা তারামাছ হাতে তুলে নেয়।

: এরা দেখতে নিরীহ হলে কি হবে ঝিনুক শিকার করতে খুব পটু।

: ঝিনুক শিকারী!

: প্রথমে তাঁবু পাতার মত করে তার ডানাগুলো শিকারের চারপাশে চেপে ধরে। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে ঝিনুকের দুটো কপাট ফাঁক করে ফেলে। সামান্য একটু ফাঁক পেলেই নিজের পাকস্থলীটা সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে ঝিনুকের নরোম দেহের চারপাশে জড়িয়ে ফেলে। এরপর ধীরে ধীরে তার খাবার হজম করে।

সৈকতে কয়েকটা বড় বড় কুকুর ঘুরঘুর করছে। এক জায়গায় মাছ কাটা হচ্ছে। বালিতে মাছের নাড়িভুঁড়ি ছড়ানো। জেলেরা নিপুণ ভাবে ছুরি চালিয়ে একটানে বিশাল মাছগুলোর শরীর ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে চিরে ফেলছে। পেটের চামড়া দু'ফাঁক হয়ে যেতেই ভেতরের লাল অংশ ঝক ঝক করে ওঠে।

কুকুরগুলো লোভী চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো ঘেউ ঘেউ করে ছুটতে থাকে। অনেক সময় সমুদ্রের ঢেউতে তীরে এসে পড়ে থলথলে জেলী মাছ। জেলী মাছ দেখলেই কুকুরগুলো উত্তেজিত হয়ে যায়। মাছের নাড়িভুড়ি পেলে সেগুলো নিয়ে টানাটানি শুরু করে। মাথার উপর গাঙচিলরা চক্কর মেরে উড়তে থাকে।

ওরা এ রকম একটি মাছ কাটার দলের সামনে দিয়ে যায়।

: কতো মাছ যে এভাবে নষ্ট হয়। এগুলো প্রসেস করে অনেক মজার মজার খাবার বানানো যেত। সে রকম কারখানা কই। সমুদ্রের কতো প্রোটিন ভরা মাছ কুকুরের পেটে যাচ্ছে। অন্যদিকে এ দেশের বহু লোক প্রোটিন স্বল্পতায় ভুগছে।

তকি সবসময়েই নানা তথ্যের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলে। বন্ধুদের মধ্যে সেজন্যে ওর নাম "জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া"।

সমুদ্রের বুক থেকে কলকল করে বাতাস আসছে। দূরে দূরে কয়েকটা নৌকা দেখা যায়। ঝাঁকা ভর্তি ঝিনুক নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। এসব ঝিনুক দা দিয়ে ফাঁক করে মুক্তোর দানা পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়। সাতদিন পর মুক্তোগুলো মসুরের ডালের মতো ধুয়ে ফেলতে হয়। সবগুলো ঝিনুকে অবশ্য মুক্তো থাকে না।

রোদে বালু তেতে উঠছে। কোথাও সাগর কলমীর পাতা

ছড়ানো। কলমীলতার ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে যায়।

: ফয়সাল, আর কতোদূর?

: সামনেই। তাঁবু খাটিয়ে আমরা দ্বীপ দেখতে বেরুবো। বিকেলে নৌকা করে সমুদ্রে গিয়ে নিচে নামবো।

পানির নিচে ছবি তোলার বিশেষ ক্যামেরা সাথে করে এনেছে। বিচিত্র বর্ণের প্রবালের ছবি ওরা পানির নিচে গিয়ে তুলবে।

ফয়সাল বিদেশের একটি নামী পত্রিকায় সেন্ট মার্টিন্স এর উপর সচিত্র বিবরণ পাঠাবে। সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর পর্যটনের সম্ভাবনা নিয়ে পত্রিকাটি একটি বিশেষ সংখ্যা বের করবে। মালদ্বীপের এক সময়ের প্রধান আয় ছিল মাছ ধরা। এখন প্রচুর পর্যটক সে দেশে যায়। তাদের আকৃষ্ট করার জন্যে মালদ্বীপে নানা পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। সমুদ্রের তীরে নারকেল বনে তৈরি করা হচ্ছে সবুজ, নরোম ঘাসের কুটির। ফলের ঠাণ্ডা রস সরবরাহ করা হচ্ছে। টলটলে নীল পানিতে ইয়ট নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা। প্রবাল দিয়ে তৈরি নানা আকর্ষণীয় জিনিশ। অথচ টেকনাফের মতো এমন সুন্দর জায়গা অবহেলিত। থাকার ভালো হোটেল নেই। সেন্ট মার্টিন্সে আসাটাই কি কষ্টের। মাছ বেপারী ছাড়া অন্যদের আসতে চাইলেই সমস্যা। যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি না হলে এখানে উৎসাহী গবেষক ছাড়া আর কেউ আসতে চাইবে না।

তকি পকেট থেকে সবাইকে নোনতা কাজুবাদাম বের করে

দেয়। টেকনাফের বাজার থেকে কেনা। কিছু বার্মীজ ঝাল আচারের প্যাকেটও কিনেছিল। চমৎকার মশলা মাখানো। খেতে বেশ লাগছে। সমুদ্রের বাতাসে খিদে লাগে।

ফয়সালের পরিকল্পনা রাতের বেলায় ওরা আগুন জ্বালিয়ে সামুদ্রিক মাছ ভেজে খাবে। ঝলসানো মাছ খাবার উৎসব করবে। লিপন চমৎকার গীটার বাজাতে পারে। ও শোনাবে 'ব্লু তাহিতি'র মন উদাস করা সুর। যে গানে নারকেল বনে হু হু বাতাস বয়ে যাবার কথা। সমুদ্রে গিয়ে কোন কোন পাখির ফিরে না আসার কথা। পাহাড়ের খাঁজে লতা, ঘাস বিছিয়ে নীড় বানায় পাখিরা। কোন কোন ঝড়ের রাতে তারা যায় হারিয়ে। তাহিতি, হাইতি দ্বীপের এসব লোক-সংগীত লিপন সুন্দর বাজাতে পারে। এই প্রবাল দ্বীপের সৈকতে ওরা নীল আলো ভরা রাতে বসে শুনবে মন উতল করা পলিনেশীয় সুর।

সমুদ্রের একটানা গর্জন শুনে হাঁটতে ওদের বেশ লাগছে। কেমন অন্য ধরনের অনুভূতি।

ওরা তখন জানতেও পারে না, ওদের পেছনে তখন একজন চুপিসারে বন বেড়ালের মতো হেঁটে আসছে। দাঁড়কাক কাধে সেই বীভৎস চেহারার লোকটি ওদের দ্বীপে নামার পর থেকেই অনুসরণ করছে। লোকটি এই দ্বীপে 'কালা শয়তান' বলে পরিচিত।

তাঁবু খাটাবার জায়গাটি ঠিক করে ফয়সাল। সবাই ঝট পট

কাজ শুরু করে দেয়। স্কাউট ক্যাম্প করে সবাই অভিজ্ঞ। মৌচাকে বহুবার তাঁবু করে থেকেছে। তিনটি ত্রিপলের তাঁবু তৈরি হয়। বাসন, মগ টাঙিয়ে রাখার জন্যে গাছের ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দেয়।

আশরাফ একটি তাঁবুর মাথায় জলদস্যুদের প্রতীকের একটি পতাকা উড়িয়ে দেয়। মানুষের মাথার খুলির নিচে আড়াআড়ি করে দুটো হাড়। এক সময় এ ধরনের পতাকা উড়িয়ে পাইরেটসরা সমুদ্রে আতংকের মতো যেত। বাতাসে পতপত করে পতাকাটি উড়ছে।

হঠাৎ কি যেন হয় আশরাফের ভেতরে। একটি ছোট বিছা এসে তার পায়ে কামড় দেয়। একটা চিনচিনে ব্যাথার স্রোত ছড়িয়ে যায় তার শরীরের কোষে কোষে। আশরাফের তখন মনে হতে থাকে সে যেন তুলোর মতো ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। সে যেন বাতাসে ভেসে যাবে। নাটকীয় ভংগিতে গলা কাঁপিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বলে ওঠে—

: হে দুঃসাহসী বন্ধুরা, হে আমার হাংগর মাছের মতো বন্ধুরা। আমরা ক্যাপ্টেন কিডকে স্মরণ করছি। বাহামা দ্বীপে তাঁর গুপ্তধন লুকানো রয়েছে। সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে প্রচুর লোক মারা গিয়েছে। লোকে বলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখনো ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রে তাদের ছায়া ছায়া মূর্তি দেখা যায়। নাবিকদের পথ ভুলিয়ে দেয়। স্মরণ করছি পর্তুগীজ হার্মাদদের। নীল সমুদ্রের বুক যারা অজস্র মানুষ খুন করে

লাল করে দিতো।

আশরাফ কেমন টেলিভিশনে দেখা 'স্লো মোশানে'র ভংগীর মতো হাঁটছে। দু'হাত তুলে কথা বলছে। দলের বাকিরা কাজ ফেলে কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। হলো কি আশরাফের। মাথা বিগড়ে গেল নাকি। আশরাফ তখনো বলেই যাচ্ছে—

: আমাদের বুকের ভেতরে ঝটপট করে ডানা ঝাপটাচ্ছে বুনোপাখি। আমরা এখন মুক্ত। হে বন্য ঈগলের সম্রাট, তুমি আমাদের দুরন্ত দুর্বার হবার শক্তি দাও। তুমি আমাদের হাতের আঙুলকে ধারালো নখরে পরিণত করো। আমরা ছিঁড়ে ফেলবো ছোট পাখিদের নরোম বুক।

আশরাফ বালুতে হাঁটু গেড়ে বসে। কপালে তার লাল ফেটি বাধা।

: এই আশরাফ, কি সব বলছিস ?

আশরাফ তখন তীব্র ভাবে তাকায়। ওর চোখ দুটো নীল। ওরা জানতেও পারলো না পেছনের উঁচু জায়গার এক ঝোপের ভেতরে বসে সেই বীভৎস চেহারার লোকটি অদ্ভুত উপায়ে তখন আশরাফকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করছে। লোকটির এক হাতে নিহত একটা পাখি। পাখিটির গলা মুঁচড়িয়ে সে হত্যা করেছে। দাঁত দিয়ে পালক ছিঁড়ে নেয়। ঠোঁটের কোনায় রক্ত লেগে থাকে। দাঁড়কাকটি কাধের ওপর ঝিম মেরে বসে। বেনিত্তার সহচর এই লোকটি। নীল চোখের

ছেলেদের ধরে নেবার জন্যে বেনিত্তা তাকে পাঠিয়েছে। আরো দশজন নীল চোখের ছেলেকে হত্যা করা প্রয়োজন বেনিত্তার। তা না হলে যে সিস্তান বাতিস্তার তিনশো বছরের পুরনো মৃতদেহটিকে জাগানো যাবে না। প্রাচীন ঐ প্রেত সাধককে তোলা যাবে না পাথরের কবরখানা থেকে। এখন পর্যন্ত একটি মাত্র নীল চোখের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। সমুদ্রের নৌকার উপরে।

'কালা শয়তান'কে সহচর হিশেবে নিয়েছে বেনিত্তা। হিমছড়ির দুর্গ বাড়িতে তাকে ডেকে এনে নির্দেশ দিয়েছে। এই এলাকার সব অশুভ শক্তিকেই জড়ো করবে বেনিত্তা। বিরাট এক দায়িত্ব নিয়ে সুদূর লিসবন থেকে ছুটে এসেছে এখানে। জিনজিরার চরে মাঝে মাঝে দেখা যায় 'কালা শয়তান'কে। অনেকে বলে সে থাকে মংডু পাহাড়ে। বহু লোক তাকে কাঁচা মাছ চিবিয়ে খেতে দেখেছে। জেলেপাড়ার শিশুরা তাকে দেখলে পালিয়ে যায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। একটা চোখ ঠেলে যেন বাইরে এসেছে। লোকটির শরীরে পচা মাছের মতো দুর্গন্ধ।

ঝোপের ভেতর থেকে অদ্ভুত পদ্ধতিতে সম্মোহিত করছে সে আশরাফকে। ওদের মধ্যে একমাত্র আশরাফের চোখ দুটোই নীল।

হঠাৎ আশরাফ কেমন ভয়ানক ভাবে তাকায় তার বন্ধুদের দিকে। ওর নাকের পাশটা ফুলে উঠছে। গলা দিয়ে কেমন

ঘর ঘর করে শব্দ হচ্ছে।

: কিরে আশরাফ, কি হয়েছে?

কেউ কিছু বোঝার অগেই আশরাফ সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকে। পেছন থেকে তকি চেঁচিয়ে ওঠে—

: আরে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

আশরাফ হঠাৎ মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকে। তখন কোত্থেকে ছুটে আসে একটা মস্ত কুচকুচে কালো কুকুর। কুকুরটা এসেই লাফ দিয়ে আশরাফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে দলের অন্যরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কুকুরটা যেন আশরাফকে ছিঁড়ে ফেলবে। ওরা সবাই দৌড়ে যায়। ফয়সালের কাছে ছিল ধারালো এক লাঠি। তাই দিয়ে সাঁই করে জোরে এক আঘাত করে কুকুরটিকে। হিংস্র কুকুরটি ঘুরে যায়। কুকুরটি প্রচণ্ড রাগে গরগর করে ওঠে। এরকম ভয়ংকর চেহারার কুকুর ওরা দেখেনি।

ফয়সাল তীব্রভাবে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে কুকুরটিকে। বাকিরাও এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। ঝোপের ভেতরে বসে 'কালা শয়তান' তখন ছটফট করে। যতোবার কুকুরটিকে প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছে ততোবার দাঁড়কাকের ডানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দাঁড়কাকটি চাপা যন্ত্রনায় গোঙাতে থাকে।

লিপন চিৎকার করে বলে—

: এই পাগলা কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হবে।

আহত আশরাফকে তকি সরিয়ে নেয়। ও কেমন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। মুখের অনেকটা অংশ কুকুর আঁচড়ে দিয়েছে। গালের মাংশ খুবলে নিতে চেয়েছিল। ফয়সালের কাছে একটি গুপ্তি লাঠি আছে। ওর ভেতরে ধারালো ইস্পাতের ছুরি লুকানো। ফয়সাল সেই ছুরি বের করে কুকুরটির শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। মরণ যন্ত্রনায় আর্ত চিৎকার করে ওঠে কুকুরটা। ঝোপের ভেতরে বসে 'কালা শয়তান' দেখে তার দাঁড়কাকের ডানার কোনা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ফয়সাল যতো তীব্রভাবে কুকুরের ভেতরে ধারালো ফলা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে কাকটি ততো নিস্তেজ হয়ে আসছে।

এবার কালা শয়তান তার ঝুলি থেকে কয়েক গোছা শিকড় বের করে আগুন জ্বালায়। কাকটি সেই আগুনের ধোঁয়াতে ঢেকে যায়।

সৈকতে কুকুরটিকে মারতে উদ্যত সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখে সমুদ্র থেকে একটা কুয়াশার মতো আবরণ উড়ে এসে যেন কুকুরটাকে ঘিরে ফেললো। কুয়াশা সরে যেতেই ওরা দেখে সেখানে কুকুরটা নেই।

: ষ্ট্রেঞ্জ! একেবারে ভৌতিক ব্যাপার। কোথায় গেল কুকুরটা! চোখের সামনে থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে ওরা। কোয়াক কোয়াক করে ডেকে এক ঝাঁক সী গাল উড়ে গেল। সাগরের ঢেউতে দুটো জেলী মাছ এসে বালুতে থলথল করছে। দূরে একটা

কুকুর ডেকে উঠলো। সবাই চমকে তাকায়। একটা ঝোপের মাথায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তকি বাইনোকুলারটা চোখে দেয়। ধোঁয়ার ভেতরে সেই বীভৎস মুখ। লোকটির কাধে এখন কোন কাক নেই। লোকটি ধীরে ধীরে নেমে যায়।

জিনজিরার চরে নেমেই প্রথমে এক রহস্যময় ঘটনার জালে জড়িয়ে গেল ওরা।

৬ সাগরতলে

আশরাফকে কয়েকটা ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঝিমুনীর ভাবটা একটু কেটে যায়। শরীর দুর্বল লাগায় শুয়ে থাকে।

: বুঝলাম না, কি যে হয়ে গেল আমার। মনে হলো অবশ হয়ে যাচ্ছি।

: হিপনোটাইজ করলে যে অবস্থা হয় তোর ঠিক তাই হয়েছিল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলি।

: কিন্তু এই দ্বীপে আমাকে হিপনোটাইজ করবে কে?

তকির তখন মনে হয় দুরের ঝোপ থেকে নেমে যাওয়া সেই

বীভৎস চেহারার লোকটির কথা। বাইনোকুলার দিয়ে দেখা। কি করছিল ঐ ঝোপের ভেতরে লোকটা? দ্বীপে নামার পর থেকেই যেন অনুসরণ করছে। আশরাফের বা গালে কুকুর আঁচড়ানোর ক্ষতচিহ্নটা লাল হয়ে আছে। সেই কুকুরটাও আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেলেদের কাছ থেকে রূপচাঁদা মাছ কেনা হয়েছে। দুপুরের খাবার জন্যে তাই ভাজা হচ্ছে। আকরাম আবার বিশেষ কায়দায় রান্না করতে চায়। মাছের রান্নার একটা মেক্সিকান পদ্ধতি জানে সে। সবজী মিশিয়ে রান্না।

দুপুরের খাওয়াটা চমৎকার হয়। সমস্ত দিনের জন্যে রুটিন করা হয়েছে। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। তারপর ক্লাশ। সেখানে সমুদ্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

আজকের বিষয় সমুদ্রের প্রাণীদের বিচিত্র জগত। এ সম্পর্কে বলবে তকি। বিকেলে নৌকা করে সমুদ্রে গিয়ে পানির নিচে নামা। প্রবাল প্রাচীরের ছবি তুলতে হবে। পাথরের ফুলের বিচিত্র এক জগত তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তকি ক্লাশে বোঝাবার জন্যে কয়েক ধরনের জেলী মাছ আর সাগর কুসুম সংগ্রহ করে এনেছে।

: সায়ানিয়া নামে এক ধরনের লালচে জেলী মাছ আছে। এরা শুঁড় বাগিয়ে শিকার ধরতে পারে। সেই শুঁড়ের ছোঁয়া

কিন্তু মানুষের শরীরে অসহ্য জ্বালা ধরায়।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলের আদিবাসীদের কাছে এক ধরনের জেলী মাছ খুব আতংকের। তার নাম ওরা দিয়েছে ইরুকান্দজী। এদের আক্রমনে ঐ অঞ্চলের জেলেদের প্রায়ই বুক পেট উরু মাথার যন্ত্রনায় ভুগতে হয়। এক ধরনের শাঁখ রাতের বেলায় নিজেদের খোলসের ছুঁচালো আগাটা তাদের শিকারের গায়ে হারপুনের মতো বিঁধিয়ে দিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। আর তাতেই ঝিনুক, শামুক ও অক্টোপাসের বাচ্চারা ঘায়েল হয়ে যায়। আন্দামানের রাক্ষুসে কাঁকড়ারা নারকেলের গায়ে ফুটো করে তার ভেতর থেকে শাঁস টেনে বের করে।

তকি কয়েক ধরনের সাগর কুসুম তুলে ধরে।

: সাগরের নিচে রয়েছে নানা জাতের 'সী অ্যানিমোন' বা সাগর কুসুম।

: আজ বিকেলে পানির নিচে গিয়ে আমরা জীবন্ত সাগর কুসুম দেখবো। সেদিন টেলিভিশনে সমুদ্রের নিচের পৃথিবীর উপর একটা চমৎকার ডকুমেন্টারী দেখাচ্ছিল। সেখানে দেখেছি কতো বিচিত্র ধরনের সাগর কুসুম। চোখ জুড়িয়ে যায়।

তকি একটা সাগর কুসুমের পাঁপড়ি খুলে ধরে।

: এরা ফুলের মতো পাঁপড়ি মেলে থাকে। সাগর কুসুম কিন্তু প্রানী। এদের পাঁপড়ি বা খোঁচা খোঁচা কাটার মধ্যেই থাকে বিষথলি। শিকার একবার নাগালের মধ্যে এলেই পাঁপড়ি গুলো

শিকারসুদ্ধ মুড়ে নিয়ে বিষথলি থেকে বিষ উজাড় করে দেয়।

: সামুদ্রিক মাছরা কি বিষাক্ত হয়? শুনেছি টুনা, হেরিং খেয়ে কখনো কখনো মানুষ অসুস্থ হয়।

: অনেক সামুদ্রিক মাছ আছে যারা বছরের কোন কোন সময় বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আসলে ঐ সব মাছেরা যেসব শ্যাওলা জাতীয় খাবার খায় তারাই হলো বিষের যোগানদার। পাফার নামে এক ধরনের মাছ রয়েছে যারা নিজেদের শরীরে বিষগ্রন্থি তৈরি করে নিয়েছে।

পাফার নামটা আকরামের কাছে বেশ পরিচিত লাগে। সে একবার জুনিয়র রেড ক্রশ দলের সম্মেলনে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিল। টোকিওর এক নামী রেঁস্তোরায় তাদের পাফার মাছ ভাজা খেতে দিয়েছিল বলে মনে পড়ে।

: কিন্তু আমি যে জাপানে গিয়ে পাফার মাছ খেয়েছি।

: জাপানীদের কাছে এ মাছ খুব প্রিয়। ডীপ ফ্রিজে মাছগুলোকে তিন চার বার করে রেখে দেয়া হয়। এতে ঐ মাছের শরীরের টেটরো ডটোক্সিন বিষ নষ্ট হয়ে যায়। তখন জাপানীরা এ মাছ রেধে খায়। একে বলে ফুড ফ্রাই। সবাই অবশ্য এ মাছ রান্না করতে পারে না। জাপানী রেঁস্তোরাগুলোতে ফুড ফ্রাই বানানোর জন্যে শুধু মাত্র সরকারী সার্টিফিকেট পাওয়া পাচকদেরই নিয়োগ করতে হয়।

: কিন্তু পাফার যে বিষাক্ত মাছ তা প্রথম জানান ক্যাপ্টেন জেমস কুক।

: ১৭৭৪ সালে ক্যাপ্টেন কুক এক সমুদ্র যাত্রায় এই মাছের মারাত্মক গুনের কথা প্রথম জানতে পারেন। তাঁর জাহাজের মাঝিদের জালে ওঠে এই মাছটি। ক্যাপ্টেন কুকের শখ ছিল বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীদের ছবি আঁকার। তাঁর সাথে থাকতো শিল্পী। কুকের নির্দেশে শিল্পী বসে গেল ঐ মাছের ছবি আঁকতে। আঁকতে আঁকতে সময় গড়িয়ে গেল। রান্নার আর সময় বেশি নেই দেখে জাহাজের পাচক আর কয়েকজন মিলে মাছটার লিভারের খানিক অংশ তেলে ভেজে খেতে বসলো। বাকি অংশটা দেয়া হলো জাহাজে বেঁধে রাখা এক শূকর ছানাকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই পাফার মাছের বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। শূকর ছানাটি পরদিন সকালে মারা গেল। জাহাজের পাচক আর অন্য যারা ঐ মাছ খেয়েছিল তাদের অনেকদিন ভুগতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন কুকের মাধ্যমেই পরে এই বিষাক্ত মাছের কথা জানা যায়।

: আকরাম, তুমি কিন্তু আবার একসপেরিমেন্ট করার ঝোঁকে আমাদের আবার বিষাক্ত মাছ খাইয়ে দিয়ো না। হয়তো তৈরি করলে বিষাক্ত সাগর শশার স্যুপ। নয়তো পাফারের ভাজি।

: ভয় নেই। বিষাক্ত কোন কিছু দিয়ে খাবারে একসপেরিমেন্ট করবো না। তবে অয়েষ্টার দিয়ে খাবার তৈরি করবো। শিলা স্তূপের সংগে আটকে থেকে জন্মে অসংখ্য অয়েষ্টার। পৃথিবীর বহু দেশে এটা এক উপাদেয় খাবার। অনেক স্থানে কৃত্রিম ভাবে অয়েষ্টারের চাষ চলে। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই

জন্মায়। শিলার উপর দেখা যায় লক্ষ লক্ষ অয়েস্টার জন্মাচ্ছে। কোথাও এতো বেশি করে জন্মাচ্ছে যে সেখান দিয়ে হেঁটে যাওয়াও কষ্টের।

: এই দ্বীপটি ঘুরে দেখার আগে আমাদের একটা মোটামুটি পরিচয় জানা দরকার। আমাদের দল নেতা ফয়সাল এ ব্যাপারে কিছু বলবে।

ফয়সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে প্রচুর তথ্য জেনে এসেছে। এ দ্বীপে বেশ কয়েকবার স্টাডি দল এসে কাজ করে গেছে। বছর কয়েক আগে প্রকৃতি আর ভূ বিজ্ঞানীদের একটি দলও এখানে বেশ কদিন থেকে গেছে। প্রামান্য ছবি তুলেছে।

ফয়সাল দ্বীপের একটি ম্যাপ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়।

: প্রধান দ্বীপের উত্তর ভাগের নাম হলো জিনজিরা। এখানেই যা কিছু জন বসতি। দক্ষিন দিকের নাম দক্ষিনপাড়া। সেখানে অল্প কয়েক ঘর মাত্র লোক থাকে। দক্ষিনপাড়া থেকে এক ফার্লং দূরে পূর্ব দিকে ছোট একটি দ্বীপ আছে। দ্বীপটি নোনা বন দিয়ে ঘেরা। মাঝে একটা ছোট লেগুন আছে। লেগুন হলো জলাশয়। জিনজিরার পূব পশ্চিম ভাগে একটি লেগুন ছিল। পরে মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে সেটি এখন বালুতে ভরে গেছে। জিনজিরা ক্রমে সরু হয়ে দক্ষিনে গিয়েছে। এর নাম গলাচিরা। সেখানে কিছু ক্ষেত খামারে ধান চাষ হয়। দক্ষিন পাড়ার পূর্ব উপকূলে ঝিনুক শামুক চুর্নে তৈরী একটা

প্রাচীর আছে। এটা ককুইনা স্তর। দক্ষিন পাড়ার পূব দিকের ফাঁড়িতে প্রচুর প্রবাল জন্মাতো। এখন এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

চেরাদিয়ার দুটি ছোট দ্বীপ কেয়া ঝোপ আর কাঁটাবন দিয়ে ঘেরা। সেখানে কোন লোক থাকে না। অথচ সেখানটাই হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা।

: আমরা তাহলে চেরাদিয়াতে তাঁবু করবো। নিঝুম, এক জায়গায়। যেখানে কোন লোকজন নেই। শুধু সাগর পাখিদের ডাক। একেবারে রবিনসন ক্রুশোর মতো জীবন কাটাতে চাই আমরা। ফিরে যেতে চাই আদিম পরিবেশে।

: প্রস্তাবটা মন্দ না।

সবাই হই হই করে উঠলো।

: সত্যিই তো, আমরা এখানে এসেছি রীতিমতো এ্যাডভেঞ্চার করতে। যদিও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রবাল দ্বীপের ওপর ভিডিওতে একটি ছবি তোলা। তবু আমরা উত্তেজনার খোরাক খুঁজবো। থ্রিল খোঁজার চেষ্টা করবো।

: য থ্রিলের ঘটনা একটু আগে ঘটে গেল। আশরাফের কাণ্ড দেখলে না।

: এটাইতো চাই। এসেছি দ্বীপে। এখানেতো নিয়ম মেনে কোন কিছু ঘটবে না। চাই সাসপেন্স।

: আমরা এখন দ্বীপটি দেখতে বেরুবো। তোমরা সবাই চটপট তৈরি হয়ে নাও।

ফয়সালের নির্দেশে ওরা তৈরি হয়। আশরাফও যাবে। দ্বীপটা এখন ঘুরে দেখবে তারা।

সমুদ্রের বাতাস বইছে সোঁ সোঁ করে। দ্বীপের নারকেল বন সে বাতাসে কাঁপে। জিনজিরা যেন ছোট একটি গ্রাম। কোথাও পানের বরোজ। সবজির ক্ষেত। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। পূব থেকে পশ্চিম দিকে। তার উপর শামুক ঝিনুকের গুঁড়া বালু। সিলকা বালু। চারদিক বালুতে থরথর করছে। বালুর উপরে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। কোথাও কোথাও কেয়া ঝাড় দেখা যায়। মাটির নিচে প্রচুর পুরান প্রবাল ও শিলাখণ্ড। এক জায়গায় দেখা গেল চাক চাক লবন।

: ওগুলো কি ?

: আগে ওগুলো লেগুন ছিল। খরাতে শুকিয়ে গেছে।

কোথাও খানিকটা জায়গা কেটে ডোবা তৈরি করা হয়েছে। মাছধরার নৌকাগুলো সাগর থেকে মাছ ধরে এনে ভোরবেলা এখানে এসে ভেড়ে। মাছ উঠানো, বেচা কেনা সব জিনজিরার বেলাভূমিতে হয়।

ওরা হাঁটতে থাকে। কোথাও নিশিন্দার ঝোপ। ঢেউয়ের গর্জন সবসময় দ্বীপটিকে চঞ্চল আর জীবন্ত করে রাখে।

পানি লবনাক্ত বলে নোনা বনের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও

মাটির নিচে রয়েছে চুনাপাথর। দ্বীপের সবখানে রয়েছে খোলশযুক্ত চুনাপাথর। এখানকার বালুর রং ধূসর। তবে যেখানে খোলসচূর্ন বালুর প্রাধান্য সেখানের রং বাদামী। জিনজিরা গ্রামে বেশ কিছু ফলের গাছ, বাঁশ ঝাড় রয়েছে। যেখানে ঘন সবুজের ছোঁয়া। বেলে মাটিতে রবিশস্য হয় না। দক্ষিনপাড়াতে শীতকালে কিছু জমিতে তরমুজ, মশলা ও শাক সবজী উৎপাদন করা হয়। কোথাও গুছি পেঁয়াজের চাষ হয়। একটি লোক পেঁয়াজ ক্ষেতে কাজ করছে। লোকটির বা হাত নেই।

সেদিকে তাকিয়ে লিপন বলে—

: নিশ্চয়ই কামটে নিয়েছে। কামট খুব চুপিসারে এসে মানুষের শরীরের অংশ কেটে নিয়ে যায়।

লোকটা ওদের কথা শুনছে।

: না, কামটে না। আমারে করাত মাছে কাটছে।

এখানের সাগরে প্রচুর করাত মাছ দেখা যায়। করাত মাছের দুধারে কাটা। এরা এদের শিকারকে ধরে সহজেই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। দেখতে অনেকটা হাংগরের মতো।

সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরছে জেলেরা। জেলেপাড়ায় হাংগর, শাদা কালো রূপচাঁদার শুটকি ঝুলছে। এক সময় এখানকার লোক বার্মার সংগে শুটকির বদলে চাল, সুপুরি আনতো।

: এ দ্বীপের লোকেরা কি কি ধরনের মাছ পায়?

: এখানে গীটার মাছ, বাঘা হাংগর, রূপচাঁদা, হেরিং, সার্ডিন, বাইন, ভেটকি, লইটা, ম্যাকারেল, গলদা চিংড়ি, লাক্কা, পিলচাউ, টোনা মাছ, লাল পর্চ, কাঁটাচান্দা, গোবী, ছুড়ি, স্কেট, শিলা মাছ পাওয়া যায়।

প্রতিদিনের জোয়ার ভাটার সাথে এ দ্বীপের জীবন বাঁধা। জোয়ারের নৌকাগুলো দ্বীপের উত্তরে যায়। বন্দর মোকাম-টেকনাফে যায়। ভাটায় মাছ ধরার নৌকাগুলো দক্ষিন সাগরে যায়। জোয়ারে ফিরে আসে। জোয়ারে সৈকত প্লাবিত হয়। ভাটায় যায় শুকিয়ে। ভাটায় সৈকতে অয়েষ্টার, গলদা চিংড়ি ধরা হয়। দ্বীপের একপাশে পানিতে কয়েকটা সী গাল মরে ভাসছে। পানিতে তেলের স্তর।

: দেখেছো, ট্রলারগুলো তেল ছেড়ে পরিবেশ কেমন দূষিত করেছে। এই পাখিগুলো মরে গেল।

তকি দেখে পানির উপরে পুরু কালো সরের মতো তেলের স্তর। তার ওপর কয়েকটা গাঙচিল মরে কালচে হয়ে আছে। নীল সাগরের পাখিরা এখন বিপদের মুখোমুখি। পরিবেশ দূষণের জন্যে এখন কোথাও কোথাও সাগর লতাও জন্মায় না। পানির নিচে বড় বড় প্রশস্ত পাতা দুলতো। দেখে মনে হতো চমৎকার বাগান।

পথ চলতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঝিনুক, শামুকের খোলা ওরা কুড়িয়ে নেয়। দ্বীপের চারপাশে বালুকাময় বেলাভূমি। ওরা হেঁটে গলাচিরায় যায়। শন ঘাসের জংগল বাতাসে ছমছম

করছে। লোকজন কেয়া গাছ কেটে ফেলছে জ্বালানীর জন্যে। কেয়া ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কাঁটা গাছ আর লতাপাতা পরিস্কার করে কেয়ার কাণ্ডগুলো দিয়ে ঘরের খুঁটি বানায়। কোথাও পিটালী, কড়ুই, মাদার, ঝিকাগাছ। এক পাশে বেশ বড় একটি কাঠ বাদাম গাছ। নোনাবনে কলা বাইন, কেউড়া, পাতুরা, সিংড়া, হারগাজার গাছ দেখা যায়। নোনা বনটি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোথাও নোনাপানি ঢুকে জমে থাকে। সবুজ ঘাস মরে যায়। লতাপাতা শুকিয়ে যায়। এই প্রবাল দ্বীপের সৌন্দর্যের উপর ওদের একটা প্রামান্য ছবি তুলতে হবে। আকরাম ক্যামেরার কাজ জানে। বেশ কয়েকটা ভিডিও ওয়র্কশপে অংশ নিয়েছে। ওরা এর আগেও আরো কয়েকটা ছবি করেছে। একটি পরিবেশ দূষনের উপর। আরেকটি শিশুশ্রমের উপর। ইতালীর এক প্রতিযোগিতায় ওদের এই ছবিটি পুরস্কার পেয়েছিল। পুরস্কার হিশেবে শব্দ-গ্রহনের এক সেট ভালো যন্ত্রপাতি পায়। এভাবেই ওদের ইউনিটটি তৈরী হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক রোমান পোলানস্কির সাথে ওরা দেখা করেছিল। পোলানস্কি এসেছিল কক্সবাজারের কাছে লোকেশান বাছাই করার জন্যে। পাইরেটস নামে একটি ছবি তৈরির পরিকল্পনা ছিল পোলানস্কির। হিমছড়ির ঝাউবন দেখে গিয়েছিল। একটি সী প্লেনে করে কক্সবাজার অঞ্চলটা দেখেছিল পোলানস্কি। পরে অবশ্য ছবিটির সুটিং এখানে হয়নি।

অনেক কষ্টে পোলানস্কির সাথে কিছুক্ষন কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল আকরাম। পোলানস্কির দুটো নীল চোখে যেন অনেক কথা মিশে আছে।

: অপনার বেশ কটা ছবি দেখেছি। ছবিতে ভয় থাকে।

: থাকে।

: নিষ্ঠুরতা থাকে।

: থাকে।

: কেন ?

: আমি ছোটবেলা থেকেই ভয় আর নিষ্ঠুরতা দেখে বড় হয়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বন্দী শিবিরে থেকেছি। প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছি। ছোটবেলার এসব ভয়ংকর স্মৃতিকে আমি কখনো মন থেকে মুছতে পারিনি।

পোলানস্কিকে তখন উদাস দেখায়।

: আমার পুরো জীবনটাই অবশ্য ঝড়ো। অস্থির। এলো-মেলো। তবে একটা কথা বলবো। ছবি তোলার আনন্দটা আছে বলে এখনো বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।

এ কথাটি আকরামকে ভীষন উদ্দীপিত করেছে। সেন্ট মার্টিন-সের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সে কথাটি মনে হলো। অশান্ত ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে।

এই দ্বীপের ওপর ছবি তোলার কাজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লিপনের এক দুলাভাই কাজ করে সার্ক এর প্রধান অফিসে। তারা চায় সার্ক দেশগুলোর পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে ছবি করতে।

মাল দ্বীপ আর নেপাল পর্যটনকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাদের ধারনা মাল দ্বীপের সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেন্ট মার্টিনসকেও সেভাবে তুলে ধরা যায়। বরং তার চাইতে আরো বেশি আকর্ষণীয় ভাবে।

ভিসিআর এর পর্দায় যখন ঝলমল করে ফুটে উঠবে প্রবাল দ্বীপের অপরূপ ছবি তখন মুগ্ধ হবে অনেকেই। ফয়সালের পরিকল্পনা পাথরের ফুল কে নানা ভাবে তুলে ধরা। বিচিত্র রংয়ের মাছরা ঝাঁক বেধে ঘুরছে। দুলছে সাগর কুসুম। সবুজ, বাদামি শ্যাওলার ঝোপ।

দ্বীপটি থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে একটি নিমজ্জিত প্রবাল প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরটা চলে গেছে দাক্ষন পুবদিকে। পানির নিচে ছবি তোলার বিশেষ ক্যামেরা নিয়ে এসেছে ওরা। স্পীড বোট প্রস্তুত। দ্বীপের বাতিঘরটি যে কোম্পানী দেখা শোনা করে তাদের কাছ থেকে বোট নিয়েছে। ফ্লিপার, ফেস মাস্ক সাথে করে নিয়ে ওরা রওয়ানা দেয়। লিপন, আকরাম আর ফয়সালের ডুবুরির ট্রেনিং আছে। বোটের এক পাশে ডুবুরির সাজ সরঞ্জাম রাখা।

শ্রীলঙ্কার ডুবুরিরা সমুদ্র থেকে ডুব দিয়ে স্পঞ্জ তোলে।

: লিপন, বেশ বড় দেখে কয়েকটা গলদা চিংড়ি ধরা চাই। চিংড়ির লাল মগজের ভাজিখেতে যা লাগবে না!

: চিংড়ি ধরতে গিয়ে হয়তো হাংগর ধরে ফেলবো।

: কুছ পরোয়া নেই। হাংগরের পাখার স্যুপও চমৎকার!

বোট ছেড়ে দেয়। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায়। আস্তে আস্তে দ্বীপ সরে যাচ্ছে। বোটের ইঞ্জিনের ভটভট শব্দ। গাঙচিলদের ডাক। পানিতে ভেসে আসছে নানা ধরনের লতা। সাগর আরচিনের ডিম আর লাভা প্লাঙ্কটন হিশেবে ভেসে বেড়ায়। কখনো কাঁকড়ার ডিমও ভাসে। সাগর শশাকে দেখা যাচ্ছে শিলা স্তূপের ডোবায়।

এখানের সমুদ্রে পানি স্বচ্ছ। ছোট ছোট উদ্ভিদ পানিতে প্রচুর ভাসছে। প্লাঙ্কটনই হলো সাগর জীবদের প্রধান খাবারের উৎস। জীবগুলো প্রবাল সাগরের সবুজ শ্যাওলা থেকে স্যুপের মতো পানি খেয়ে ফেলে। খোলা সাগরের উদ্ভিদগুলো দ্বীপের বেলাভূমিতে আসে ও ভাটায় বালুতে আটকা পড়ে।

সমুদ্রের বুকে কি আশ্চর্যভাবে কোটি কোটি প্রবাল কীট মিলে তৈরী করেছে এ দ্বীপটি।

বোট চলেছে ছুটে। সোঁ সোঁ হাওয়া।

: আচ্ছা ফয়সাল, প্রবাল দ্বীপের ওপর ছবি তুলতে এসেছি অথচ দ্বীপটি কেমন করে হলো তার ইতিহাস জানি না।

: ঠিক কথা। যেতে যেতে শোনা যাবে।

: নানা ধরনের কীট সাগরের পানি থেকে চুন জাতীয় পদার্থ আহরণ করে আবার নানা প্রক্রিয়ায় তা ছেড়ে দেয়। প্রবাল কীটের দেহের বাইরের দিকে চুন দিয়ে তৈরী এক আবরণ থাকে। মৃত্যুর পর এ কীটের দেহাবশেষ জমা হতে হতে প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টি করে। আমরা খানিক

পরেই ঐ রকম এক প্রাচীর দেখতে যাচ্ছি।

: প্রবাল ছাড়াও শামুক, ঝিনুক, তারামাছ প্রভৃতির চুন নির্মিত খোলস দ্বীপ তৈরিতে সাহায্য করে। সেন্ট মার্টিনে প্রায় ত্রিশ, পয়ত্রিশ ধরনের প্রবাল আছে। নানা আকারের।

: মানুষের মাথার মগজের মতো অনেক প্রবাল দেখছি।

অনেক দূর চলে এসেছে বোটটা। দূর থেকে নারকেল গাছের বনকে ঘন সবুজ দাগের মতো দেখাচ্ছে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের সোজা দক্ষিণে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু প্রবাল জন্মে। লাক্কা আর মাল দ্বীপেও প্রবাল রয়েছে। এখানে অবিরাম পুরনো প্রবাল ও নতুন প্রবালের সৃষ্টি হচ্ছে। ককুইনা প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জীবের খোলস চুন ও শামুক ঝিনুক দিয়ে এই ককুইনার সৃষ্টি।

তকি বাইনোকুলার দিয়ে দেখছে—

: ককুইনা প্রাচীরে পাখিরা বাসা বাধবে।

: অ্যালবাট্রসরা যেমন নির্জন দ্বীপে ডিম পাড়তে যায়।

: আমি 'পাখি দেখার ক্লাবের' সদস্যদের নিয়ে এ দ্বীপে আবার আসবো।

: তোমার মাথায় শুধু ঐ একটাই চিন্তা।

: ফয়সাল, ছবিতে কিন্তু সূর্যাস্তের বেলাভূমির একটা দৃশ্য থাকতে হবে। সেই সাথে ঝাঁক বেধে পাখিদের ফিরে আসার দৃশ্য।

: তকি হলো পাখি পাগলা। আচ্ছা, আর কিছু কি তোমার চিন্তায় নেই।

: দেখার মতো চোখ থাকা চাই।

হঠাৎ দেখা গেল একটি মাছ পানি থেকে উড়ে বেশ খানিকটা পথ গিয়ে ঝুপ করে পানিতে পড়ে। এদিকে বেশ উড়ুক্কু মাছ দেখা যায়। লম্বায় এক ফুটের মতো। হঠাৎ করে ওড়ার সময় মনে হয় যেন পাখি। আবার কয়েকটা উড়ন্ত মাছ দেখা গেল। বিকেলের রোদে ওদের শরীর ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

ফয়সালের কাছে ম্যাপ। একটা জায়গায় এসে বোটটা থামাতে বলে।

: এর নিচেই আছে প্রবাল প্রাচীর।

লিপন আর আকরাম ঝটপট তৈরী হয়ে নাও।

ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার পরে নিলো তিনজন। তাদের এখন রীতিমতো অভিযান কারী মনে হচ্ছে। টেন্টুনে মাস্কটা পরীক্ষা করে। তকি গ্যাসট্যাংক, হোস কানেকশন আর ভারী ডাইভিং বেল্ট বের করে।

বোটের পাশ থেকে দড়ির সিড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এখুনি পানিতে নামবে ওরা। ক্যামেরা নিয়েছে আকরাম। ফয়সাল সাথে করে ধারালো বল্লম নেয়। সমুদ্রের নিচে কোন হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হতে পারে।

সিড়ি দিয়ে প্রথমে নামলো লিপন। সমুদ্রের দিকে পিঠ দিয়ে হাত ছেড়ে দিলো সিড়ি থেকে। এটাই কায়দা। ঝুপ করে পড়লো চিত হয়ে। মেরীন একাডেমীতে ট্রেনিং নেবার সময় এভাবেই শিখেছে। ডুবে গেল লিপন। পর পর আকরাম আর ফয়সালও ডুবে গেল সাগরতলে।

৭ কালো বেড়ালের মূর্তি

পানির নিচে সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে এসে গেল তিনজন। অজানা রহস্য ভরা এক জগতে। ছায়া ছায়া অন্ধকার। আলো থেকে হঠাৎ করে বুঝি অন্ধকারে আসা। চোখ এখন সয়ে আসছে। ফ্লিপার নেড়ে নেড়ে ওরা নামতে থাকে। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট ছোট মাছ। ওদের সাথে মাছেদের ধাক্কা লাগে। একটা মাছের কি চমৎকার হলুদ কমলা ডোরাকাটা দাগ।

গভীর সমুদ্রে সূর্যের আলো আসে না। সেখানে নিকষ কালো অন্ধকার। সূর্যের আলোতে থাকে নানা মাপের ঢেউ। পানিতে সবচেয়ে আগে হারিয়ে যায় লাল আলোর ঢেউ। তারপর কমলা আর হলুদ আলো।

প্রবাল প্রাচীরটাকে দেখা যাচ্ছে। ঝকঝক করছে। নীলাভ আলোর মাঝে পাথরের ফুলের সারি। কতো আকার। কোনটা গাছের ডালের মতো। কোনটা আবার ঝোপড়া গাছের মত। টলটলে পানিতে অপরূপ দেখায়। নানা রংয়ের লতা দুলছে। সাপের মতো পেচিয়ে উঠছে। নকশা খচিত শিলাখণ্ড।

প্রবাল সাগর হলো মাছের ঘাঁটি। এক ঝাঁক কাঁকড়া তিরতির করে ভেসে গেল।

ওরা প্রবাল প্রাচীরের কাছে আসে। কতো রংয়ের মাছ ঝিলমিল করছে। দাঁড়া উচিয়ে বাগদা চিংড়ি যাচ্ছে। কয়েকটা বাগদা ধরতে পারলে ভালো হতো। কি বিরাট আকারের। সাধে কি বংগোপসাগরের এই চিংড়ির লোভে মাছ দস্যুরা আসে। একটা বাগদা লিপনের ফেস মাস্কের সামনে। চিংড়িটা যেন অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে। লিপন চিংড়ির বেরিয়ে আসা চোখ দেখতে পায়। ছোট ছোট সাগর অশ্ব ভেসে যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা গিরগিটির মতো। ঘোড়া-মুখো। এদের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে প্রবালের ডানায় আটকে থাকে। লিপন দেখে বড় বড় দুটো কাছিম পা নেড়ে নেড়ে ভেসে যাচ্ছে। সামনের ডানা দুটো দিয়ে পানি টেনে সাঁতার কাটে।

এখানে অনেক কাছিম ডিম পাড়তে আসে মালয়েশিয়ার সাগর থেকে। লিপন খপ করে একটা কাছিমকে ধরে ফেলে।

অমাবস্যার, পূর্নিমার রাতে এসব কাছিমরা সাগর থেকে উঠে বেলাভূমিতে যায়। সেখানে সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে করে সামনের দু'ডানা দিয়ে বালু সরিয়ে দেয়। তারপর পেছনের পা দুটো দিয়ে দ্রুত মাটি সরিয়ে একটা গর্ত করে সেখানে ডিম পাড়ে। দুটো তিনটে করে ডিম পেড়ে বালু দিয়ে আবার গর্তটা পুরে ফেলে। তারপর সামনের দু'ডানা

দিয়ে বালু সমান করে মিলিয়ে রেখে যায়। তারপর তরতর করে সাগরে নেমে যায় কাছিমরা। কাছিমটি লিপনের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছে।

দূরে একটা বিশাল ছায়া দেখা যায়। স্পার্ম তিমি। ঢালু নাক দিয়ে ফোয়ারা ছাড়ে। বাচ্চা তিমি। এদের দাঁত আছে। অন্যজাতের তিমিগুলো টাকরার হাড় দিয়ে শিকার করে। তিমিটা কয়েকটা ছোট স্কুইড খেয়ে ফেললো। স্পার্ম তিমির উগড়ে দেয়া খাবারের মধ্যে স্কুইডের ঠোঁট খুব বেশী পাওয়া যায়। কারণ স্কুইডের এই অংশটা তারা হজম করতে পারে না। পানির ওপরে এ ধরনের তিমিকে দেখলে মনে হবে কোঁচকানো বিশাল একটা কাঠের গুঁড়ি। মস্ত একটা ড্রামের মতো চওড়া কপাল। তার ভেতরে ভরা তেল। একেকটা মাথায় দশ থেকে পনের ব্যারোল তেল থাকে। যেন তেলের এক ভাসমান ভাণ্ডার। এদের তেলের জন্যে প্রচুর তিমি হত্যা করা হয়। দশ লাখের জায়গায় এখন স্পার্ম তিমির সংখ্যা তিন লাখে এসে ঠেকেছে।

আকরাম দূর থেকে স্পার্ম তিমিটার ছবি তোলে। সেন্ট মার্টিনসের প্রবাল প্রাচীরে তিমি দেখা গেছে এটা ওদের ছবিকে আকর্ষণীয় করবে। স্কুইডগুলো গিলে খাচ্ছে তিমিটা। অনেক সময় তিমিরা ভীষন শব্দ করে শিকারকে হতভম্ব করে দেয়। তারপর শিকার গিলে ফেলে।

ওদের ছবিতে এই তিমির ছবি দেখাতে হবে। আবেদন

রাখতে হবে যাতে এদের হত্যা না করা হয়। ভারত মহাসাগর এখন তিমির এক বিশাল ভাণ্ডার। পেশাদার তিমি শিকারীরা এর প্রতি লোভী দৃষ্টি রাখছে। স্পার্ম তিমি ছাড়াও নীল তিমি আর অত্যন্ত দুর্লভ ঠোঁটঅলা তিমিও দেখা যায়। অনেক বিজ্ঞানী পানির নিচ থেকে তাদের গা ছমছম করা শব্দ পেয়েছে।

শ্রীলঙ্কার জেলেদের জালে ডলফিন ধরা পড়লেই ওদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এখন তিমি আর ডলফিন শিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আমেরিকায় অভিনব ভাবে এক প্রচার চলে। রাবারের এক বিশাল তিমি তৈরি করে ভাসিয়ে দেয়া হয়। নাম দেয়া হয় ফ্লো। সেই তিমিটা ভাসতে ভাসতে বিভিন্ন শহরের উপর দিয়ে যায়। ফ্লোর গায়ে ঝোলানো ছিল একটি আবেদন। তাতে লেখা—আমাকে মেরো না তোমরা।

লিপন খুব সাবধানে তিমিটার শব্দ রেকর্ড করার চেষ্টা করছে। আকরাম দক্ষ ক্যামেরাম্যানের মতো প্রবাল প্রাচীরের বিভিন্ন কোন থেকে তিমিটার ছবি তুলতে লাগলো। এক সময় বিশাল লেজ নাড়িয়ে চলে গেল তিমিটা। বিশাল ছায়া মিলিয়ে গেল। ফ্লিপার নেড়ে নেড়ে এদিক সেদিক ভাসছে ওরা। আলো ছায়ার ঝিলিমিলি পরিবেশে অপূর্ব এক পৃথিবী। কয়েকটা জেলি মাছকে দেখা গেল ছোট মাছ শিকার করতে। জেলি মাছের শরীর স্বচ্ছ। সবটাই পানি। ভেতরটা ফাঁপা। চার-

দিকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য আঙুল। এই সব আঙুলে বিষাক্ত হুল লাগানো থাকে। জেলি মাছ এর সাহায্যে শিকার ধরছে। দৃশ্যটা খুব ক্লোজ আপে তোলে। জেলিমাছ হুল দিয়ে শিকার ধরে ধীরে ধীরে হজম করছে।

ফয়সাল লিপনকে ইশারা করে। নতুন ধরনের এক দৃশ্য। শ্যাওলা ঝোপে একটা বাগদা চিংড়ি খোলস ছাড়ছে। এমন দৃশ্য সহজে দেখা যায় না। চিংড়ির গায়ে শিঙের মতো শক্ত জিনিশের তৈরি খোলস। সমুদ্রের পানি থেকে চুন শুষে নিয়ে এই খোলস মজবুত করে। বাইরের এই শক্ত খোলস শরীরের সাথে সাথে বাড়তে পারেনা। তাই এরা মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে। বছরে পাঁচ, ছ'বারের মতো। চিংড়ির খোলস ওপর দিকে ফেটে যায়। তখন পা দিয়ে খোলসটা ছাড়িয়ে ফেলে। এই দৃশ্যটি তুলতে পেরে আকরাম খুশি হয়।

হঠাৎ দেখা যায় ভীষণ আকৃতির একটা বিশাল স্কুইড ছুটে আসছে। দেখতে দানবের মতো। স্কুইডের শরীরটা টর্পেডোর মতো। লেজের দিকটা তীরের মতো সূচালো। কাঁধের কাছে দুটো ফুটো। তা দিয়ে পানি টেনে নিয়ে স্কুইড একটা নলের ভেতর দিয়ে তা খুব জোরে বের করে দিতে পারে। নল দিয়ে যখন সামনের দিকে পিচকিরির মতো পানি ছুটে বেরোয় তখন স্কুইড তীরের মতো পেছন দিকে ছোটে। যেন জট ইঞ্জিন। নলের মুখ আবার পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে এরা সামনের দিকেও এগিয়ে যেতে পারে।

ফয়সাল বল্লম দিয়ে আঘাত করে স্কুইডকে। আটটা পা ছাড়াও স্কুইডের রয়েছে দুটো লম্বা আঁকশি। এই দানব স্কুইডটার আঁকশি খুব লম্বা। আঁকশির আগায় রয়েছে জোরে আঁকড়ে ধরার জন্যে ছোট ছোট বাটির মতো চুষনি।

স্কুইডের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। ফয়সালকে অসংখ্য চুষনি বসানো জোরালো আঁকশি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। সাগর তলে শুরু হলো লড়াই। ফয়সালের একটা পা জড়িয়ে ধরেছে। জোরে লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করে। লিপন ছুটে আসে। তার সাথে আছে লম্বা ছুরি। সেটা দিয়েই স্কুইড-টাকে প্রবল ভাবে আঘাত করতে থাকে।

স্কুইডরা খুব হিংস্র হয়। এদের চুষনি তিমির গায়ে গোল গোল আঘাতের দাগ বসিয়ে দেয়। স্কুইডটা বুঝতে পারলো শত্রু শক্তিশালী। তখন কালির মতো জিনিশ ছুঁড়তে থাকলো। চারদিকের পানি কালো হয়ে গেল। তার আড়ালে পালিয়ে গেল স্কুইডটা।

প্রবাল প্রাচীরের আশেপাশে বিচিত্র প্রাণীদের জগত। ওরা দেখে কয়েকটা রে মাছ বিরাট বিরাট পাখা দুলিয়ে ভেসে আসছে। চেপটা চেহারার মাছ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাদুড়। নয়তো বিশাল আকারের প্রজাপতি। দু'পাশের পাখনা চওড়া হতে হতে পাখায় পরিণত হয়েছে। এক ধরনের রে মাছ বিজলি সৃষ্টি করতে পারে। একদিকে প্রবাল প্রাচীরের খাঁজে উজ্জ্বল সাগর কুসুম ঝুলছে। সেখানে

প্রাচীরের ফাটলের কাছে কদাকার চেহারার একটি বড় মাছ থির হয়ে ভেসে আছে। কয়েকটা ছোট মাছ সেই বড় মাছের শরীর থেকে ময়লা খুটে খুটে পরিস্কার করে দিচ্ছে। ওদের বলে নাপিত মাছ।

পাখনা তুলে কানকো ফাঁক করে দেয় মাছ। নাপিত মাছ মাছের চামড়ার পিচ্ছিল ময়লা পরিস্কার করে। হাঁ করে থাকে মাছ। দাঁতের গোড়ায় লেগে থাকা ময়লাও বের করে নিয়ে আসে নাপিত মাছ। অনেক চিংড়ি মাছও রয়েছে যারা অন্য মাছেদের গা পরিস্কার করে দেয়।

আকরাম প্রবাল প্রাচীরের খুব কাছ থেকে ছবি তুলছে। সবুজ, লাল, নীল, বাদামি রংয়ের লতাগুল্ম চারদিকে। ক্যামেরা নিয়ে ঝুঁকে আছে আকরাম।

প্রথমে দেখতে পায় লিপন। একটা হাংগর এগিয়ে আসছে। ছুঁচালো দাঁতের জোরালো কামড়ে এরা মানুষের শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলে। বিশেষ ধরনের মাংশপেশী থাকার ফলে এরা ক্ষিপ্রগতিতে পানি কেটে এগিয়ে যেতে পারে। পাখনাগুলো চওড়া। হাংগরের ঘ্রানশক্তি অত্যন্ত প্রখর। হাংগরদের ওপর তোলা একটি শ্বাসরুদ্ধকর ছবি দেখেছিল লিপন। ছবিটির নাম জঅজ। ছবিটা বানাবার কৌশলের জন্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মিয়ামীর সৈকতে হঠাৎ ভয়াল মৃত্যু হয়ে দেখা দিল হাংগররা। সমুদ্রে যারা সাঁতার কাটতে যায় তাদের ওপর শুরু হলো নিঃশব্দ আক্রমন।

পানি রক্ত মেখে লাল হয়ে যায়। পানিতে সামান্য পরিমাণে রক্তের নিশানা পেলে হাংগররা খাবারের উল্লাসে একেবারে হন্যে হয়ে ওঠে। মানুষকে বিনা কারণে আক্রমণ করে হাংগর। অনেক সময় দেখা গেছে মানুষকে হাংগর আস্ত গিলে ফেলেছে। পানি কেটে ছুটে আসছে ভয়াল হাংগর। ত্রিশ কোটি বছর ধরে এই প্রাণীটা টিকে রয়েছে সমুদ্রে। হাংগরের শরীর হাড়ের বদলে কার্টিলেজ দিয়ে গড়া। পানিতে ভেসে থাকার জন্যে মাছেদের শরীরে যে বাতাস ভরা ব্লাডার থাকে তাও নেই এদের। এর ফলে পানির মধ্যে সবসময় এদের ছুটে বেড়াতে হয়।

হাংগরটা এগিয়ে এসে প্রথম ফয়সালকে আক্রমণ করে। লিপন বল্লমটা বাগিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসে। ফয়সালকে হাংগরটা লেজ দিয়ে একটা বাড়ি মারে। সে আঘাতে ফয়সাল খানিকটা ছিটকে যায়। লিপন হাংগরের পেট লক্ষ্য করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বল্লমটা বিঁধিয়ে দেয়। ফয়সাল ছিটকে যাবার সময় দেখতে পায় হাংগরটাকে গেঁথে ফেলেছে লিপন। কৌশলে বল্লমটা একটানে খুলে আবার বিঁধিয়ে দেয় লিপন। হাংগরের শরীর থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। প্রাণীটার প্রাণশক্তি অদম্য। সাংঘাতিক ভাবে জখম হওয়ার পরও বেঁচে থাকে। সহজে কাবু হতে চায় না।

ফয়সালকে আবার লেজের ঝাপটায় দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর করাতের মতো ধারালো দাঁত মেলে ছুটে যেতে থাকে।

হাংগরটা শাদা। অনেক নাবিকরা এর নাম দিয়েছে শাদা শয়তান। অবিশ্বাস্য বেগে এরা পানির ভেতরে ছুটতে পারে। আকরাম হাংগরের আক্রমণের কিছু ছবি তুলে নিয়েছে। শাদা হাংগরের আরেক জাতি হলো ম্যাকো। এদিকে ম্যাকোদেরও দেখা যায়। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় 'নোভা স্কটিয়া' নামে এক যুদ্ধজাহাজ শত্রুপক্ষের টর্পেডোর আঘাতে ডুবে যায়। প্রায় হাজার খানেক মাঝি, মাল্লা, সৈনিক তখন পানিতে পড়ে যায়। হাংগররা তখন ঘিরে ধরে তাদের। পরদিন সকালে মানুষগুলোর পা কাটা শরীর ভেসে ওঠে পানির ওপর। ওদের মধ্যে একজনও বেঁচে ছিল না।

সবকিছু খায় হাংগররা। ওদের কোন বাছ বিচার নেই।

ফয়সাল এবার নিজেকে সামলে নিয়েছে। লেজের ধাক্কোতে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। লিপনের বল্লমের আঘাতে আহত হয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে হাংগরটা। করাতের সারির মতো দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে। হাংগরটা এখন ফয়সালের মাথার উপর। বিশাল শাদা পেট দেখা যাচ্ছে। কোমরে গোঁজা ছুরিটাকে একটানে বের করে। নেমে আসছে চকচকে শাদা পেট। ছুরিটা দিয়ে হাংগরের পেটটাকে চিরে ফেলে। এবার হাংগরের পেট দু' ফাঁক হয়ে যায়। ছুরির টানে পেটের চামড়া কচকচ করে ফাঁক হচ্ছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নাড়িভুড়ি। হাংগরটা এখন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এক সময় প্রবাল প্রাচীরের ওপাশে ভেসে যায়

মৃত হাংগরটার শরীর। পানির নিচে নেমে বারবার বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। কয়েকটা সাগর কুসুম ভেসে গেল। তার পেছনে কয়েকটা অ্যানিমোনি। এদের নানা রংয়ের লম্বা শুঁয়া ছড়িয়ে আছে। সবুজ, লাল, কমলা রংয়ের শুয়া। ফুলের পাপড়ির মত লম্বা শুয়া পানিতে কাঁপছে। দুটো কাঁকড়া সেই শুঁয়া দেখে আকৃষ্ট হয়ে যেই কাছে এলো অমনি শুঁয়াগুলো তাদের চারপাশ দিয়ে জড়িয়ে ধরে। শুঁয়াতে বিষ আছে। সেই বিষ ঢেলে কাঁকড়াগুলোকে মেরে ফেলবে। এমনি করে অ্যানিমোনিরা শুঁয়ার থাবায় চিংড়ি, শামুক ও নানা মাছকেও মেরে ফেলে।

ছোট রংগীন মাছের একটা ঝাঁক ভেসে যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন পানির তলায় বুদবুদের দেয়াল সৃষ্টি করে তার মধ্যে মাছ আটকে রাখার জন্যে। এই বুদবুদের দেয়াল মাছেরা ডিংগাতে পারে না। এভাবে দেয়াল তৈরি করে মাছের চাষ করা সম্ভব।

ফয়সাল, লিপন আর আকরাম ভাবতেও পারেনি সেন্ট মার্টিনসের কাছে পানির নিচে এতো সুন্দর প্রবাল প্রাচীর রয়েছে। এখানে যেন প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা। ঝিলিমিলি আলো আঁধারীর মাঝে ওৎ পেতে আছে বিভীষিকা। কতো বিকট চেহারার প্রাণী। যতো নিচে নামা যায় ততো বেশি রহস্য। ততো বেশি অন্ধকার। সেখানে কোন মাছের দৈত্যের মতো বিশাল দাঁতালো হাঁ। সেই হাঁ দেখলেই ভয়

করে। কোন মাছের চিবুকে লম্বা বটের ঝুরির মতো দাড়ি। কোন মাছেয় নাকের সামনে ঝোলানো রয়েছে আলোজ্বলা লণ্ঠন। কতো অদ্ভুত তাদের ভংগী। কোন মাছ সাঁতার কাটে সটান খাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কয়েকটা লম্বা চুরুট আকৃতির রোগাটে মাছকে দেখা যায়। আকরাম দেখেই চমকে যায়। এদের নাম ব্যারাকুডা। খুব হিংস্র মাছ। ডুবুরিরা এদের প্রচণ্ড ভয় পায়। ব্যারাকুডা মানুষকে যখন আঘাত করে তখন তায় গায়ে লম্বালম্বি গভীর ক্ষত রেখে যায়।

ডুবুরিরা পানির নিচে নামে সম্পদের খোঁজে। বালির তলায় রয়েছে নানা ধরণের রত্ন। সেই রত্ন খোঁজার সময় অনেক সময় হাত চলে যায় ঈল মাছের গর্তে। ঈল মাছ তখন সেই হাত কামড়ে ধরে। কামড়তো নয় যেন মরণ কামড়। ডুবুরিদের জীবন তখন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

পানির নিচে কতো উত্তেজনা। ওরা খুঁজতে এসেছিল থ্রিল। চারপাশেই এখন নানা রহস্যের আলোড়ন।

প্রবাল প্রাচীরের বিভিন্ন দিকের ছবি তোলা হচ্ছে। টকটকে লাল রঙের কয়েকটা চিংড়ি বড়শির মতো আঁকশি বাড়িয়ে অন্য ছোট মাছকে আকৃষ্ট করে। তারপর শক্ত দাঁড়া দিয়ে তাদের আঁকড়ে ধরে। কয়েকটা মাছের শরীর থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। জোনাকির মতো ঠাণ্ডা আলো এসব মাছের। এসব মাছের চামড়ার ওপর এক ধরনের আলো

দেয়া জীবানু বাস করে। এরাই এ ধরণের আলো সৃষ্টি করে। শ্যাওলা ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে এসব আলো দেয়া। মাছকে চমৎকার লাগে। পাথরের ফুলের মাঝে যেন আলোর ফুল।

ফয়সাল ওদেরকে আরো সামনের দিকে যেতে ইশারা করে। দূরে প্রাচীরের কাছে আবছা মতো কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। ওরা এগুচ্ছে। বিশাল কালো ছায়া। আর একটু সামনে যেতেই দেখে একটা ভাংগা জাহাজ। পুরনো আমলের এসব পালতোলা জাহাজে করে বোম্বেটে দস্যুরা ঘুরতো। হয়তো একসময় ডুবে গেছে। কেউ খোঁজ রাখেনি। জাহাজটা দেখে ওরা তিনজনেই উত্তেজিত হয়। ফয়সাল জাহাজের কাঠামো দেখেই বুঝতে পারে তিন চারশো বছরের পুরনো জাহাজ। অনেকটা অংশ ভেংগে গেছে। মাস্তুলের দিকটা একদিকে হেলে আছে। ওরা তিনজন সাবধানে জাহাজের ভেতরে ঢোকে। ছোট ছোট মাছ ঘুরছে। কয়েকটা কুচ কুচে কালো অক্টোপাশ একটা কেবিনের খোলের ভেতর থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসে। শাদা হাতির দাঁতের মতো চোয়াল। রক্তের মতো টকটকে লাল চোখ। এ ধরণের অক্টোপাশের পা কালো জাল দিয়ে জোড়া লাগানো। অক্টোপাশগুলো শুঁড় নেড়ে চলে যায়। জাহাজের ভেতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার। লতানো উদ্ভিদ লকলক করে দুলছে। ভাসছে সাগর কুসুম। করাত মাছ চলে গেল সাঁ করে। জাহাজটার

ভেতরে প্রথমে ঢোকে ফয়সাল। শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি বলে সবটা অংশ পচে যায়নি। ফয়সালের শরীর শিহরিত হলো। প্রাচীন লোকদের চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পেল সে। কারা ছিলো এ জাহাজে। কেমন করে ডুবলো। কোন হার্মাদ জাহাজের আক্রমণ কি হয়েছিল এর উপর। সবগুলো মানুষ কেই হত্যা করা হয়েছে। কোথাও মনে হচ্ছে পোড়াকাঠ। তবে কি আগুন লেগেছিল জাহাজটিতে। হঠাৎ ফয়সালের মনে হলো কে যেন তার পা জড়িয়ে ধরেছে। ভীষণ চমকে গেল ফয়সাল। নিচু হয়ে দেখে ভাংগা কাঠের ফাঁক থেকে একটা কঙ্কালের হাত বেরিয়ে এসে তার পা আটকে রেখেছে। কঙ্কালটার খুলির ভেতরে একটা লাল কাঁকড়া। লিপন বা দিক দিয়ে সাঁই করে ঢোকে। লিপনের হাতে একটা পাত্র। পাত্রের বুকে সাপের মূর্তি খোদাই করা। হার্মাদরা এ ধরণের পাত্রে ফলের রস খেত। একটা কেবিনের দরজা খোলা। সাঁতড়ে ভেতরে যায় লিপন। কয়েকটা বড় পাত্র একপাশে কাত হয়ে আছে। পাত্রগুলোর ভেতর থেকে একটা ডোরাকাটা সাপ বেরিয়ে আসে।

এই ডুবোজাহাজটি তাদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। আরেকটু সামনে যায়। লতানো উদ্ভিদের ভেতরে একটি ঘর থেকে বুদবুদ বেরিয়ে আসছে। আলো দেয়া কয়েকটা মাছ ঝিলমিল করে। সেই ঘরটা ওদের খুব টানছে। ডাইভ দিয়ে সেটার ভেতরে ঢোকে। ঢুকতেই মনে হলো কয়েকটা আলোর

রেখা যেন বিন্দু বিন্দু হয়ে ভাসছে। সামনে তাকাতেই চমকে গেল ফয়সাল। একটা কালো বেড়ালের মূর্তি। পাথরের তৈরি। আশ্চর্য রকমের জীবন্ত মনে হয়। লাল উজ্জ্বল পাথরের চোখ জ্বলজ্বল করছে। মূর্তিটার দিকে তিনজনই তাকিয়ে থাকে। কালো বেড়ালটা বুঝি ফ্যাঁচ করে ডেকে লাফ দেবে। অদ্ভুত রকমের এক রোমাঞ্চ হচ্ছে। মূর্তিটা কি একটু নড়ে উঠলো। ফয়সালের মনে হলো মূর্তিটা এক অশুভ শক্তির প্রতীক। এক সময় পিশাচ সাধকরা এ ধরনের মূর্তির উপাসনা করতো। বাহামা, হাইতুরু, ইষ্টার দ্বীপের পিশাচ সাধকদের মাঝে এ রকমের মূর্তির ব্যবহার দেখা যেত। তারা বিশ্বাস করতো মৃত শিশুর হাড়ের তৈরি বাঁশি দিয়ে অমাবস্যার রাতে ডাইনীদের কান্নার সুর বাজালে পাথরের কালো বেড়াল জীবন্ত হয়ে উঠে দুস্প্রাপ্য শেকড়ের সন্ধান দেবে। যে শেকড় পেলে রক্তচোষাদের গোপন ঘাঁটিতে প্রবেশ করা যায়। রক্তচোষারা জানে অনেক মন্ত্র। যে মন্ত্রে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে রহস্যময় পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। ফয়সাল বল্লমটা দিয়ে মূর্তিটিকে স্পর্শ করে। অমনি ওর সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে যায়।

ঠিক সেই সময় হিমছড়ির দুর্গবাড়ির একটি কক্ষে হরিণ ছালে বসে থাকা বেনিত্তা চমকে ওঠে। তার সামনে নীলাভ কৃষ্টাল বল। সেই বলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বেনিত্তা।

হাঁসের পাতার মতো চামড়ার জোড়া লাগানো অদ্ভুত আকৃতির হাতটি দিয়ে বেনিত্তা বলকে স্পর্শ করে। বলের ভেতরে এখন রহস্যময় শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। সিস্তান বাতিস্তার গুপ্ত-ধনের সন্ধানে এই বল অনেক তথ্য দেবে।

গত ক'দিন থেকেই বলটিতে শক্তি সঞ্চার করতে চাচ্ছিল বেনিত্তা। সময় হয়নি। দুর্গবাড়ির পেছনের শণঘাসের জঙ্গল থেকে আসা কালো বেড়ালকে দিয়ে শকুনের বাচ্চার পিত্ত খাইয়েছে। তবু বলের ভেতর থেকে কোন নির্দেশ পায়নি। প্রথমে পেয়েছিল লাল নিশানা। নীল চোখের ছেলের মৃত্যুর সময় বলের মাঝে লাল ফোঁটা ঘন হয়ে উঠেছিল। আজ আবার বলে আলোর রেখা কাঁপছে। যেই মাত্র ফয়সাল ডুবো জাহাজের ভেতরে কালো বেড়ালের মূর্তিটিকে স্পর্শ করলো তখন কৃস্টাল বলে একটা আলোর বিন্দু থিরথির করে উঠলো। উত্তেজিত হয় বেনিত্তা। এটাই সেই চিহ্ন। সিস্তান বাতিস্তার গুপ্তধনের স্থানে কোন শক্তি এখন প্রবেশ করেছে। বহুদিন জায়গাটি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। এখনো বেনিত্তা ঠিক জানে না জায়গাটি কোথায়। কিন্তু কৃস্টাল বলের আলোর কাঁপুনি দেখে বুঝতে পারছে সেই স্থানে এখন অন্য শক্তি এসে প্রবেশ করেছে। বেনিত্তাকে এখন হিংস্র দেখায়। ফিসফিস করে কাকে যেন ডাকে। পেছনে চুপিসারে এসে দাঁড়ায় কালো শয়তান। বেনিত্তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

: আজ রাতেই তোমাকে যেতে হবে।

: কোথায় ?

: সেই ছেলেটার নীল চোখের মণি চাই। হাতের তিনটে আঙুল চাই।

: ঐ ছেলেটার বন্ধুরা খুব সাহসী। বিছার কামড় দিয়ে ছেলেটাকে আমি অবশ করে ফেলেছিলাম। ওর বন্ধুদের জন্যে শিকারকে বাগে পাওয়া গেল না।

: আর কটা নীল চোখের ছেলের খোঁজ পেয়েছো ? আমার লাগবে আরো দশটি।

: বিভিন্ন জায়গায় ছ'টি ছেলের খোঁজ পেয়েছি।

: কিন্তু ঐ ছেলেটিকে আমার লাগবেই।

: আমি খুব চেষ্টা করছি। ওরা আমার পোষা সংগীটিকে মেরে ফেলেছে।

কালা শয়তান তার দাঁড়কাকটাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।

: আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। দায়িত্ব তোমাকে পালন করতেই হবে। আমি এখন জানতে পেরেছি ওর সেই বন্ধুরাই সেই শক্তি হয়ে গুপ্তধনের স্থানে প্রবেশ করেছে।

: তাই নাকি ? কোথায় গেছে ওরা ?

: জায়গাটি হিশেব করে আমি ঠিক ধরতে পারছিনা। তবে ওরা যেখানে আছে তার কাছাকাছি কোথাও হবে।

: ওরাতো আছে জিনজিরার চেরাদিয়ার চরে। তার আশে পাশে সমুদ্র। ওদের অবশ্য সমুদ্রে যাবার কথা। বাতিঘর কোম্পানীর কাছ থেকে নৌকা ঠিক করেছিল।

কি একটা ভেবে বেনিস্তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে কি সমুদ্রের নিচে রয়েছে সেই গুপ্তধন। কৃস্টাল বলের আলোর কাঁপুনি দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটি কোন তরল স্থানে।

কালা শয়তান বেনিস্তার সামনে মাথা নিচু করে বসে। বেনিস্তা চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করছে। কড়িকাঠের ফাঁকে বসে থাকা খুঁড়ুলে পেঁচাটা পালক ফুলিয়ে ডেকে ওঠে। বেনিস্তা এখন ডাকছে লুসিফারকে।

: হে মহান লুসিফার, তোমার নির্দেশে এখানে এসেছি আমি। সিস্তান বাতিস্তার উত্তরপুরুষ। তার গুপ্তসম্পদ আমার চাই। ঘরের ভেতরে তখন কেমন নীলাভ ধরণের আলো ছড়িয়ে যায়।

: তুন্দ্রা অঞ্চলের হরিণের নাভির দোহাই, হেলসিংকির পপলার বনের রক্তচোষার দুর্গের দোহাই, লিসবনের সাইপ্রেস বাগানের ধূসর নেকড়ের দোহাই আমাকে এখন শক্তি দাও। এলিজাবেথ বাথোরীকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। কাউন্টেস রক্ত মেখে স্নান করছে। সিস্তান বাতিস্তা নীল চোখের ছেলেদের রক্ত মেখেছিল এই দুর্গবাড়িতে। কবর থানায় তার শরীর এখনো অবিকৃত রয়েছে। তাতে তুমুল শক্তি সঞ্চার করতে হবে। বাতিস্তা জেগে উঠতে চাইছে। তার উপাচার চাই। এখন দূত যাবে। নীল চোখের ছেলেদের খোঁজে।

সমস্ত ঘরটায় অদ্ভুত রকমের এক গন্ধ ছড়িয়ে যায়। কালা শয়তানের ঝুলিতে বিষাক্ত বিছা নড়ে ওঠে।

: তুমি এক্ষুনি যাও। সময় হয়ে আসছে।

ওপর থেকে খুঁড়লে পেঁচার একটা ডিম পড়ে যায়। ডিমটা বেনিত্তার ঠিক সামনেই পড়ে ভাংগে। খোলার ভেতর থেকে টলটলে কুসুম ছড়িয়ে যায়। বেনিত্তা সেই কুসুমের দিকে তাকায়। হ্যা, সময় হয়েছে। বন বেড়ালের মতো চাপা স্বরে গরগর করে ওঠে বেনিত্তা। তাকে এখন হিংস্র দেখাচ্ছে।

: যাও তুমি।

জানালা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। কালা শয়তান পেছন দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এক্ষুনি তাকে জিনজিরার চরে যেতে হবে।

সমুদ্রের নিচ থেকে উঠে আসছে ফয়সাল, লিপন আর আকরাম। বোটে বসে তকি আর আশরাফ তাকিয়েছিল পানির দিকে। পানির নিচে তিনটি ছায়া দেখা যায়। গ্যাস সিলিণ্ডারে টান পড়েছে।

বোটে উঠে বসে গ্যাস মাস্ক খুলে ফেলে তিনজন। শেষ বিকেলের রোদ নরোম হয়ে এসেছে। এতোক্ষণ পানির নিচে অন্য পৃথিবীতে ছিল ওরা। খোলা বাতাস বুক ভরে টেনে নিলো। ওরা সজীব হয়ে ওঠে। তকি কৌতুহলী। আকরাম বোটের একপাশে ক্যামেরা রাখছে।

: কেমন ছবি তুললে ?

: চমৎকার।

: প্রবাল প্রাচীরটা কি রকম?

: দেখলে চোখ ঝলসে যাবে। রংয়ের কি বাহার!

ফয়সাল বল্লমটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

: কিন্তু সাংঘাতিক একটা কাণ্ড হয়েছে!

: কি?

: স্কুইড আর হাংগরের সাথে লড়াই।

: আরে এটাইতো এ্যাডভেঞ্চার।

: তারচাইতেও সাংঘাতিক একটা খবর আছে।

: যেমন

: আমরা পানির নিচে একটা ডুবোজাহাজের সন্ধান পেয়েছি।

: তাই নাকি! দারুন ঘটনা।

: প্রবাল প্রাচীরের খাঁজে আটকে আছে একটি ডুবোজাহাজ।

: কতো দিনের পুরনো বলে মনে হলো?

: তিন চারশো বছরের পুরনো। পর্তুগীজ জাহাজ বলে মনে হলো।

: এ অঞ্চলে পর্তুগীজদের আগমনের উপর লেখা একটি বই এনেছি। ওটা থেকে হয়তো কোন তথ্য পাওয়া যাবে।

তকি যেন দেখতে পায় পালতোলা একটি জাহাজ নীল সমুদ্রে তরতর করে ভেসে যাচ্ছে। মৌসুমী বাতাসে পাখির ডানার মতো পাল উঠেছে ফুলে। ডেকে ঘুরছে বোম্বেটেরা। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। কানে রিং। কারো একটা চোখ কালো

কাঁচ দিয়ে ঢাকা। হো হো করে হাসছে বোম্বেটেরা। খোলা তলোয়ার ঝক ঝক করে। এক কোপে মানুষের মাথা নামিয়ে দেয়। হাত একটুও কাঁপে না। তকি যেন সেই জাহাজটিকে দেখছে। ঢেউ ভেংগে ছুটে যাচ্ছে। পালের কাছাকাছি উড়ছে গাঙচিল।

: তোমরা কি জাহাজটার ভেতরে গিয়েছিলে?

: অবশ্যই। যদিও ভয় ছিলো কোন হিংস্র প্রাণী যদি লুকিয়ে থাকে ওর ভেতরে। তবে হাংগরের সাথে লড়াই করে সাহস এসে গেল।

: কি দেখলে জাহাজে?

: একটা কেবিনে দেখি পাথরের কালো বেড়ালের মূর্তি। ওটাই সবচাইতে ইন্টারেস্টিং।

স্পীড বোট দ্বীপের দিকে রওয়ানা দেয়। পাখিদের এখন নীড়ে ফেরার সময়। বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সূর্যটা প্রকাণ্ড লাল থালার মতো ডুবছে। সমুদ্রের বুককে তখন অপরূপ দেখাচ্ছে।

এক সময় কালচে রেখার মতো সেন্ট মার্টিনস দেখা যায়।

৮ তুয়াতারার থাবা

বোটটা জিনজিরার তীরে এসে ভেড়ে। বোট থেকে প্রথমে লাফ দিয়ে নামে তকি। ওর পা পড়ে পিচ্ছিল জেলীমাছের উপর। পায়ের নিচটা থিকথিক করে উঠলো। একদিকে বেশ ক'জন লোকের জটলা। কয়েক জন ছুটে যাচ্ছে। এক জনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ওখানে একটা সমুদ্রের গরু ধরা পড়েছে।

: সমুদ্রের গরু! সে আবার কি জিনিশ।

: সমুদ্র কি মাঠ নাকি যে সেখানে গরু চড়বে?

: নিশ্চয়ই কোন আজব প্রাণী হবে।

: চলতো গিয়ে দেখি।

ঝিনুক আর সাগর শ্যাওলা কুড়িয়ে ফিরছে ছোট ছেলে মেয়েরা। ওরা ভিড়ের কাছে গিয়ে দেখে জেলেদের জালে একটা ডুগং ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা সীল মাছের মতো। ধূসর চামড়ার প্রাণীটার লেজের পাখনা চওড়া। মাঝখানে একটু খাঁজ। দুটি কোন সূঁচালো। বেশ বড় মাথা। ছোট মুখ। উপরের মাংশল ঠোঁট ঘোড়ার খুরের আকারে নিচের ঠোঁট ছাপিয়ে নিচে নেমেছে।

জেলেরা এই প্রাণীটিকে ধরতে পেরে খুশি। এর তেল, চর্বি বেশ দামে বিক্রি হবে। অনেকে বলে সাগর গরু। অনেকেই এ প্রাণীর দাঁত গুঁড়ো করে খায়। খাবারের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। মাথা ধরার হাত থেকে বাঁচার জন্যে খায় ডুগং এর ঘিলু।

বেলাভূমিতে পড়ে আছে ডলফিন আকৃতির প্রাণীটা। পিঠের চামড়ায় বেশ কটা আঘাতের দাগ। কয়েকটা নীল ডুমো মাছি উড়ছে। সমুদ্রের নিচে যে প্রাণীটা নানা ভাবে ভাসতো এখন সেটা একতাল থলথলে মাংশপিণ্ড। প্রাণীটার নাকের ছিদ্রের কাছে রক্তের দাগ। ওল্ড টেস্টামেন্টে এই প্রাণীটির উল্লেখ আছে। যেখানে হিব্রুরা সিনাইয়ের ভেতর দিয়ে বিশাল নৌকাকে টেনে নিয়ে যাবার পথে বিছিয়ে ছিল এই প্রাণীর চামড়া।

অনেকদিন পর জিনজিরা চরের জেলেরা একটা সাগর গরু ধরেছে। কে একজন পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে। ডুগং ধরা পড়ার খবর শুনলে তাই গ্রামের বদ্যিরা ছুটে আসে। বেশি দাম দিয়ে কিনে নিতে চায়। অনেক ধরণের রোগ সারাবার কাজে লাগে সাগর গরু।

লোকদের ভিড় ঠেলে যায় তকি। একটা বুড়ো জেলে প্রাণীটাকে খোঁচাচ্ছে। তেলতেলে শরীর দেখে জেলেদের লোভ হচ্ছে। প্রাণীটার গায়ে এক ধরণের তীব্র গন্ধ। এই প্রাণীটা পানির নিচে ডুব দিয়ে সবুজ জলজ ঘাস ছিঁড়ে আনে।

তারপর পাড়ের উপর জমা করে রাখে। দিনের বেলায় পানির নিচে বিশ্রাম নেয়। রাতের বেলায় এসে এসব ঘাস খায়। কখনো দেখা যায় ডুগংরা সন্তান পিঠে নিয়ে ঘুরছে। প্রাচীনকালের নাবিকরা এসব দেখেই নানা রহস্যময় গল্প তৈরি করতো। বলতো মৎস্যকুমারী দেখেছে। রূপকথার মিশেল দিয়ে এসব গল্প চালু হতো। ছড়িয়ে যেত বন্দর থেকে বন্দরে।

কতো গল্প মৎসকুমারীদের নিয়ে। গ্রীক কবি হোমার লিখেছিলেন অদিসি। তাতে রয়েছে মৎসকুমারীদের এক কাহিনী। ট্রয়ের যুদ্ধের পর বীর ইউলিসিস ফিরছে দেশে। সাথে অনুচরেরা। সমুদ্রে এক সময় উঠল ঝড়। জাহাজ তখন ঝড়ের কবলে ছুটতে থাকে। ভাসতে ভাসতে চলে যায় সেই রহস্যে ঘেরা অঞ্চলে। মৎসকুমারীদের দ্বীপের কাছাকাছি। যে দ্বীপ নিয়ে নাবিকদের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল। সেই মৎসকুমারীরা গানের সুরের জাদু দিয়ে নাবিকদের টেনে আনে। ইউলিসিস ভাবলেন এই গান শুনলে নাবিকদের বিপদ হবে। তারা কুহকের জালে জড়িয়ে যাবে। আর তাদের ফেরা হবে না। তাই মোম লাগিয়ে তিনি প্রত্যেকটি নাবিকের কর্ণকুহর বন্ধ করে দিলেন। যাতে সেই মায়াবী সুর তাদের কানে প্রবেশ করতে না পারে।

মধ্যযুগের অনেক নাবিক দাবী করতো তারা মৎসকন্যা দেখেছে। ১৬১ সালে বিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক হেনরি হুডসন জানালো সে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উপকূলে মৎসকুমারীদের দেখেছে। ডুগং

দেখেই এসব গল্প চালু হয়েছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। অনেক দ্বীপের লোকেরা ডুগং এর গুটিভরা চামড়া ব্যবহার করে নৌকার আচ্ছাদনের জন্যে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। লিপন ফ্লাশ দিয়ে প্রাণীটার ছবি তোলে। ডুগংটাকে দড়িতে বেঁধে বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে জেলেরা রওয়ানা হয়। কে একজন বলে, আজ উৎসব হবে। অনেকদিন পর জালে এমন প্রাণী ধরা পড়েছে। বিশাল কিছু ধরলেই জেলেপাড়ায় উৎসব হয়। একঘেঁয়ে জীবনে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। প্রাণীটার মাংশ সুস্বাদু হলে কেটেকুটে সবাইকে ভাগ করে দেয়। ফয়সাল বলে

: ঠিক আছে। আজ রাতে আমরা জেলেপাড়ায় যাবো। এই উৎসবের ছবি তুলবো। বিভিন্ন দ্বীপে মাছ মারার উৎসবের উপর একটা ছবি দেখেছিলাম। বোর্নিওর জেলেরা বিরাট মাছ ধরতে পারলে সুগন্ধী ঘাসের তৈরি মুখোশ পরে নাচে। তাহিতি দ্বীপে ধারালো ঝিনুক দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে উলকি আঁকা হয়। হাইতুরুতে কাঁকড়া মেরে উৎসব হয়।

জেলেদের কাছ থেকে কয়েকটা বড় দেখে ভেটকি কিনে নেয়। মাছ বেচা কেনা চলছে। ম্যাকারেল মাছের বড় স্তুপ। চেরাদিয়াতে ফিরে মালপত্র গুছিয়ে রাখে। তাঁবুর উপরে জলদস্যুদের প্রতীকের সেই পতাকাটি উড়ছে। লিপন তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ শুরু করে দিলো।

: বাগদা চিংড়ি পাওয়া গেল না ?

: চিংড়ি ! আরেকটু হলেই হাংগরের খাবার হয়ে যাচ্ছিলাম।

: আহা, গরম ভাতের সাথে যা টেস্ট লাগতো বাগদা চিংড়ির মগজ।

তকি ওপাশ থেকে বলে

: একবার এই বাগদা চিংড়ি ধরা নিয়ে কিন্তু ফ্রান্স আর ব্রাজিলের মধ্যে রীতিমতো এক যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিলো।

: সে কিরকম ! চিংড়ির জন্যে যুদ্ধ ! এ যে দেখছি মজাদার গল্প। তকি, এসব বানিয়ে বলছিস ?

: একেবারে সত্যি ঘটনা। ৬৩ সালের মার্চ মাসের কথা। বাগদা চিংড়ি ধরার জন্যে ছ'টা ফরাসী জেলে জাহাজ একেবারে ব্রাজিলের উপকূলে যায়। ব্রাজিলের যুদ্ধ জাহাজ তখন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল উপকূল থেকে ষাট মাইল দূরে সমুদ্রের ভেতরে। ব্রাজিল দাবী করলো তার দেশের মহী সোপানে যে সব প্রাণী চরে বেড়ায় তা তারই সম্পত্তি। কিন্তু ফ্রান্স এ যুক্তি মানলো না। তার জেলে জাহাজের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে পাঠিয়ে দিল এক ডেষ্ট্রয়ার। অন্যদিকে ব্রাজিলও তার নৌবহরকে হুকুম দিলো যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে। ব্যাপার হলো গুরুতর। যুদ্ধ বাধে আর কি। কিন্তু ফ্রান্স এ সময় তার ডেষ্ট্রয়ার ফিরিয়ে নেয় বলে আর সংঘাত বাধেনি।

ফয়সাল জগিং করছে। আকরাম টেপে নিগ্রো মাঝিদের গান

ক্যালিপসো ছাড়ে। বেলাফন্টের ভরাট গলার সুর ছড়িয়ে যায়। গানের কথাগুলো কি চমৎকার। যখন চাঁদ উঠবে তখন সমুদ্র আমাকে ডাকবে। মাছের ঝাঁক আমাকে ডাকবে। ঘাসের বন আমাদের ডাকবে। অথচ আমরা এ সব ডাক শুনতে পাবো না। আমরা একাকি হলেও মাছেদের বন্ধু হতে পারবো না।

বেলাভূমিতে দাঁড়ালে দেখা যায় ঢেউয়ের সাথে নীল আলোক দানা এসে তীরে আছাড় খেয়ে ভেংগে আলো ছড়ায়। ঢেউ-য়ের সাথে ভেসে আসে এই আলোকদানা।

ফয়সাল ভিসিআর এ ব্রাজিলের রাক্ষুসে মাছ পিরানহার উপর তোলা একটা ক্যাসেট দেখতে থাকে। একটা দৃশ্যে দেখা গেল আহত একটা গরু আমাজান নদী পার হচ্ছে। তারপর দেখা গেল মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে তার কঙ্কালটা লোকেরা টেনে তুলছে। ক্ষুরধার দাঁতঅলা ছোট মাছ পিরানহা গরুটার এ অবস্থা করে। মাংশ খুবলে নেয়। ভয়ংকর হিংস্র এই মাছ। আমাজানের আতংক। প্যারাগুয়ের পিরানহা সব-চাইতে হিংস্র। ওখানকার একটি নদীর নাম মরটেস। মৃত্যুর নদী। যে সব পোকাখেকো পাখি পানির খুব কাছ দিয়ে ওড়ে তারাও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়না। পানি থেকে লাফিয়ে ওঠে পাখিদের অনেক সময় ধরে পানির নিচে নিয়ে যায়। পানির নিচে ধারালো ছুরির মতো ভেসে বেড়ায় পিরানহা। নৌকা থেকে পানিতে আঙুল ডোবানোর সাথে

সাথে পিরানহা আঙুল কেটে নেয়।

কালো আর লাল পিরানহা খুব মারাত্মক। এদের ভোঁতা চোয়ালে ফাঁক ফাঁক ত্রিকোণাকার একটু বাঁকা ক্ষুরধার দাঁতের সারি। অনেকের আছে লালচে বা হলদেটে পাখনা।

ছবিতে কুরানটাইন নদী দেখানো হচ্ছে। এই নদীর ধারের প্রত্যেকটি পুরুষ বাশিন্দার কারুর হাতের আঙুল, কারুর উরুর কারুর হাতের উপর থেকে আধুলির আকারে মাংশ যেন ছুরি দিয়ে কাটা। এগুলো পিরানহার কীর্তি।

তকি আর লিপনও এসেছে ছবিটি দেখতে। রুদ্ধশ্বাসে দেখার মতো ছবি। ফয়সাল চাইছে ওদের দলের সদস্যরা এ ধরণের ভালো কিছু ডকুমেন্টারী ছবি দেখুক।

অনেক কষ্ট করে দুর্গম এলাকায় গিয়ে এসব ছবি তোলা। এ ধরণের ভালো ছবি বেশি করে দেখলে তাদের অনেক শেখা হবে। সেন্ট মার্টিনসে ওরা এসেছে একদল ভিডিও কর্মী হিশেবে। পিরানহার ছবিতে তখন দারুণ দৃশ্য। বলিভিয়ার এক নদীর ধারের সরাইখানার খাবারঘরের অংশটি খুঁটি পুঁতে নদীর উপরে তৈরি। সেখানে এসেছে একদল পর্যটক। তারা পিরানহা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। একটা মরা শূকরকে দড়ি বেঁধে ঘরের মেঝের মধ্যে চোরা দরজা দিয়ে নদীর ভেতরে নামিয়ে দেয়া হয়। ঐ নদীতে থাকে রাক্ষুসে পিরানহার ঝাঁক। পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেনে তোলা হলো শূকরটির কঙ্কাল। কতো দ্রুতগতিতে শূকরের মাংশ সাবাড় করে

ফেলেছে পিরানহা। মাছটি দেখতে ডিমের আকারের।

ছবিতে দেখানো হচ্ছে পিরানহার ডিম পাড়ার দৃশ্য। ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে আমাজানে। ঘাসে, শিকড়ে ডিম পাড়ে পিরানহা। ডিম ফোটার পর জেলির মত পোণারা ঐসব উদ্ভিদের গায়ে জড়াজড়ি করে লেগে থাকে। ক্যামেরায় বড় করে দৃশ্যটা তোলা। ফয়সাল ক্যাসেট থামিয়ে ওদের দৃশ্যটা কয়েকবার দেখায়।

: আকরাম, লক্ষ্য করো মাছের ডিম পাড়ার দৃশ্য কি ভাবে তুলেছে। আমি চাই আমাদের ছবিটিতে কাছিমের ডিম পাড়ার দৃশ্য।

: তুলবো।

: স্পেশাল লেন্স তো আছে?

: নিশ্চয়ই।

নদীর পানিতে রক্ত মিশলে সেই গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে পিরানহা। পানির উপর লাফালাফি করতে থাকে। তখন দেখলে মনে হয় যেন খই ফুটছে।

বাইরে আগুন জ্বালিয়ে আকরাম রান্না করছে। ভেটকি মাছ ফ্রাই হচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে লিপন। শিকে গেঁথে মাছ ঝলসানো হচ্ছে। তার উপর ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে মশলার গুঁড়ো।

: রান্নার আর কদ্দুর?

: হয়ে এলো।

: আজকে নতুন কি খাওয়াবে ?

: ঝিনুক শাঁসের স্যুপ। শ্যাওলার সালাদ।

: হুররে। রবিনসন ক্রুশো হতে আর বাকি নেই।

: দুঃখিত। ক্রুশো নিশ্চয়ই দ্বীপে ভি,সি,আর চালিয়ে দেখতো না।

: আকরাম, আমি একটা মগকে কাল আসতে বলেছি। সে কাছিমের ডিম চালান করে। মগটা কিছু নতুন সামুদ্রিক ঘাস চিনিয়ে দেবে। যা রান্নার সাথে মেশালে স্বাদ বাড়বে। পুষ্টি বাড়বে।

: যেমন থাই স্যুপে লেবু ঘাস মিশিয়ে দেয়া হয়।

আকরামের রান্না শেষ। ভেটকি ফ্রাই। চমৎকার হয়েছে। সবাই রান্নার তারিফ করে।

চারদিকে চাঁদের মায়াবী আলো। কুক্কা পাখির ডাক শোনা যায়। জেলেপাড়ার একজন এসে জানায় উৎসব শুরু হতে একটু দেরী আছে।

ওদের ছবিটা কেমন হবে তা নিয়ে ভাবছে। ফয়সাল নতুন কোন তথ্য পেলেই নোট বইতে লিখে রাখছে। তকির একটা কথা ভালো লাগে

: জিনজিরার চরে যে সব ছোট ছেলেমেয়েরা সবুজ কাছিমের ডিম বিক্রী করছে আমরা তা ছবিতে দেখাবো। দেখাবো কেমন করে এসব ডিম কিনে নিয়ে যায় বেপারীরা। চালান করে হোটেলে। কি ভাবে বংগোপসাগরের বিরল শ্রেণীর সবুজ

কাছিমদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। যে ভাবে ঘড়িয়ালের ডিম নষ্ট করছে পদ্মার চরের রাখাল ছেলেরা। এমনি ভাবে আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে অনেক প্রাণী। সবুজ কাছিমদের রক্ষা করার জন্যে আবেদন জানাতে হবে ছবিতে।

তকির সাথে একমত হয় ফয়সাল। এতে ছবিটা নতুন অর্থ পাবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে। হাওয়াই দ্বীপের নেনে জাতের হাঁস যখন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তখন আবেদন জানানো হয়েছিল নেনে হাঁসদের রক্ষা করার জন্যে। অনেক কষ্টে নেনে হাঁসের কয়েকটা ডিম সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হলো। বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করে বাড়ালেন হাঁসের সংখ্যা।

: জানো, পাইরেটসরা একসময় কাছিমের লোভে একটি দ্বীপে যেত। সেই দ্বীপ থেকে কাছিম ধরে ধরে জাহাজের খোলে রেখে দিত। নোনা সমুদ্রের মাঝে এমন জীবন্ত টাটকা মাংশ আর কোথায় পাবে? সেই দ্বীপের নাম গালাপাগস। স্পেনীয় ভাষায় গালাপাগা মানে বড় কাছিম। ঐ দ্বীপে রয়েছে প্রচুর বড় বড় কাছিম।

: দ্বীপটি খুব রহস্যময়। অনেক অদ্ভুত ধরণের বিকট চেহারার প্রাণী রয়েছে সেখানে। যাদের দেখলে রীতিমতো আঁতকে ওঠার কথা। যেসব প্রাণীর বহু লক্ষ বছর আগেই পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা সেগুলো এখনো স্বচ্ছন্দে দ্বীপ গালাপাগসে ঘুরছে। ফিরছে।

তকি তাঁবু থেকে একটি বই বের করে আনে।

: এ বইতে গালাপাগসের দারুণ একটা বর্ণনা আছে।

: কার বই ?

: হারমান মেলভিলের।

: মবি ডিকের লেখক। উঃ শাদা তিমি নিয়ে কি দুর্দান্ত উপন্যাস লিখেছিল। সমুদ্রের শাদা শয়তান তিমিটার সাথে ক্যাপ্টেন আহাবের লড়াই। পড়লে গা শিউরে ওঠে।

: সেই ঔপন্যাসিক মেলভিল ১৮৪১ সালে ঐ দ্বীপে একবার গিয়ে পাঁচ মাস ছিলেন। তাঁর চমৎকার বিবরণের কথা এখানে লেখা আছে। আমি পড়ছি।

গাছের ডালে ঝুলছে বাতি। সমুদ্রের একটানা গর্জন। সব মিলিয়ে কেমন রহস্যময় পরিবেশ। চেরাদিয়ার চরে রাতের বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে। ওরা যেন জাহাজডুবি হয়ে এই জনমানবহীন দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। নোনা গন্ধের বাতাসের ঝাপটায় হরকোচার ঝোপ দোলে। শহরের ধোঁয়া আর হট্টগোলের কোন রকমের স্পর্শ নেই। আকাশটাকে মনে হচ্ছে মস্ত নীল হরিণের পিঠ। সেখানে অজস্র নক্ষত্র। তকি এইরকম ছমছমে পরিবেশে মেলভিলের বিবরণ পড়তে থাকে,

'পৃথিবীতে এমন নিরানন্দ নিঃসঙ্গ স্থান আর আছে কিনা সন্দেহ। এই সম্মোহক দ্বীপাবলির ওপর প্রকৃতির এক বিশেষ অভিশাপ রয়েছে। তাই এখানে কোনো পরিবর্তন আসেনা। ঋতুরও তেমন কোন আসা যাওয়া নেই। তেমনই শেষ নেই

দুঃখের। এরা শরতও জানে না, বসন্তও জানে না। দ্বীপ-পুঞ্জে বৃষ্টি প্রায় পড়েই না, শুধু আগুনের হলকা। মানুষ ও নেকড়ে উভয়েই গালাপাগসকে বর্জন করেছে। কিছু সরীসৃপ, মাকড়সা কিংবা সাপই হলো এখানকার প্রধান বাসিন্দা। এখানে জীবনের মুখ্য শব্দ হলো হিস হিস ধ্বনি। কাছে পিঠের উদ্ভিদের না আছে কোন নাম না আছে কোন ফল। দ্বীপসমূহের উপকূল এবড়ো খেবড়ো কঠিন লাভা দিয়ে গড়া। তাদের ওপর সবসময় আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি। আর মনে হচ্ছে অপার্থিব কিছু বিহংগ উড়ে উড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে কিছু বিষন্ন ধ্বনি।'

: বর্ণনাটা বেশি কাব্যিক। ১৮৩৫ সালে গিয়েছিলেন ডারুইন। তার আগে সাড়ে চারশো বছর আগে বিশপ ফ্রাই। পেরু যাবার পথে নৌকাডুবি হয়ে এলেন গালাপাগসে। সেখানে দেখেন হাজার হাজার কুশ্রী গিরগিটি আর বিশাল আকারের কচ্ছপ। তারা কচ্ছপ মেরে খেলেন। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারলেন পাখিদের। জলদস্যুরা পরে এ দ্বীপের খবর পায়। তারা বাণিজ্য জাহাজ লুট করে সেখানে যেত ধনদৌলত ভাগাভাগি করতে।

বাতাসে ওদের তাঁবুর ওপর টাঙানো পাইরেটসদের পতাকাটা পতপত করে উড়ছে।

বাতির স্বল্প আলোতে মানুষের মাথার খুলির ছবিটি কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আশরাফ হঠাৎ করে নাটকীয় ভংগীতে

পাইরেটসদের কথা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

হিমহড়ির দুর্গবাড়িতে তখন বোনিভা বসে পিশাচ সাধনা করছে। লিসবনের শহরতলীর কবরখানার ঘাসবন। দীঘল ঘাস সেখানে ছমছম করে দোলে। এক বৃদ্ধ জিপসি তাকে জানায় ঐ ঘাসবনে থাকে শয়তানের দূত। একটা ধূসর বরণের নেকড়ে হয়ে।

বুড়ো জিপসির সাথে দেখা বার্চবনের এক উৎসবে। অমাবস্যার মুটঘুটে অন্ধকার। সীল মাছের চর্বি দিয়ে জ্বালানো হয়েছে বাতি। মিটমিটে আলো। অন্ধকারটা আরো ভুতুড়ে হয়ে এসেছে। বিভিন্ন এলাকার পিশাচ সাধক জিপসিরা সেখানে সমবেত হয়েছে। সীল মাছের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁশি বাজাচ্ছে একজন। সেই ভয়াল সুরে বুকের ভেতরে পর্যন্ত কাঁপন ধরে যায়।

চাপা সুরে মন্ত্র পাঠ করছে একজন ঝলসানো তিতির পাখির সামনে বসে।

—হে লুসিফার, নেকড়ের ধূসর কলজে চিবিয়ে খাবো আমরা। কাঁচা কলজে খাবো। আমাদের স্বভাব তখন হবে বুনো। বনে পাহাড়ে গিয়ে খুঁজবো তখন হারানো আত্মাদের। তারা কোথায় আছে? কোন প্রাণীর ভেতরে মিশে আছে তারা। কোন থাবার ভেতরে লুকিয়ে আছে তারা। কোন ধারালো দাঁতের মাঝে ছড়িয়ে আছে তারা।

দেখো, কেমন করে নিচ্ছে ছিঁড়ে বনডুমুরের ছাল। কেমন করে নিচ্ছে ছিঁড়ে কালো পশুর মাংশ। কেমন করে নিচ্ছে ছিঁড়ে হলুদ পাখির পিত্ত।

বুনো ফলের ঝাঁঝালো রস খেয়ে অস্থির হয় বেনিত্তা। তাঁর পূর্বপুরুষ সিস্তান বাতিস্তা ছিলো প্রেত সাধক। তার মাঝেও আশ্চর্য ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে সেই রহস্যময় স্বভাব। বুড়ো জিপসি পাখির গলা মুচড়িয়ে দেয়।

: বেনিত্তা, তোমার চক্র এখনো পূর্ণ হয়নি।

: কেমন করে হবে?

: মহান লুসিফারের দূতের কাছে যেতে হবে।

: কোথায় পাবো তারে?

: নাবিকদের কবরখানায়।

: কেমন ভাবে আছে?

: ধূসর নেকড়ে হয়ে। তাকে খরগোশ দিতে হবে।

অনেক পরিশ্রম করে পিশাচ সাধক হয়েছে বেনিত্তা। জানে সিস্তান বাতিস্তার গুপ্তধন পেতে হলে বাতিস্তার আত্মার পূর্ণ জাগরণ চাই। কালো শয়তানকে পাঠিয়েছে জিনজিরার চরে। সাথে করে দিয়েছে তুয়াতারা। মন্ত্রপড়া এক প্রাণী। নীল চোখের ছেলেকে মারতে পারবে তুয়াতারা। তার সাধনার জন্যে দরকারী জিনিশগুলো এখনো জোটেনি। চাই নীল চোখের মণি। চাই হাতের কাটা আঙুল। তুয়াতারাকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছে সে এক জিপসির কাছ থেকে।

খুব দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। কালা শয়তান চলে গেছে জিনজিরার চরে। বেনিস্তা দেখছে কৃষ্টাল বল। এই দুর্গবাড়ির কোথাও লুকানো আছে সিস্তান বাতিস্তার ডাইরি। সেটি উদ্ধার করতে হবে। কৃষ্টাল বলে আবছা ভাবে মড়ার খুলিটা ভেসে উঠলো। চেরাদিচায় চরের নোনাবনে তৈরি ফয়সালদের তাঁবুর ওপরে টাঙানো পতাকাটির ছবি।

আকরাম তাকিয়ে আছে দূর সমুদ্রের দিকে। ঢেউ এর মাথায় নীল আলো জ্বলছে। হঠাৎ কিসের চলন্ত ছায়া দেখা যায়। টর্চের আলো ফেলে। কয়েকটা বড় কাছিম চলেছে। সমুদ্র থেকে উঠে এসে কাছিমরা যাচ্ছে ডিম পাড়ার জায়গা খুঁজতে। আকরামের পেছনে তকি এসে দাঁড়ায়। টর্চের আলোতে কাছিমের খোলা চকচক করে।

: ডারুইন গালাপাগস দ্বীপে গিয়েছিল কাছিমদের পর্যবেক্ষন করতে। কাল থেকে আমরাও তা করবো। শুধু কাছিম না সেই সাথে এই দ্বীপের অন্য প্রাণীদেরও পর্যবেক্ষন করবো।

: ডারুইন গালাপাগসে গিয়ে কি দেখেছিলেন?

: সমতলের কাছিমদের খাবার মাংশল ক্যাকটাস। অন্যদিকে পাহাড়ি কাছিমরা খায় গাছের পাতা। মাটিতে পড়া বুনো ফল। পাহাড়ে ক্যাকটাস হয় না। পানি সে দ্বীপে সহজে পাওয়া যায় না। তাই পাহাড়ের উপর যে ক'টা ঝর্না আছে

সেখানেই সব কাছিমরা ভীড় জমায়।

: সেই দ্বীপে ডারুইন অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সে দ্বীপে ডিম পাড়তে আসতো দুষ্প্রাপ্য জাতের এলবাট্রোসরা। ঐ দ্বীপটি ছাড়া ওদের ডিম পাড়ার জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল দ্বীপে মশার উপদ্রব প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। মশার দাপটে এলবাট্রোসরা ডিমে তা দিচ্ছে না। কারণ মশা ওদের চোখের কোণে হুল ফুটিয়ে অস্থির করে তুলেছে। পাখিরা ডিম ফেলে চলে যাচ্ছে। ডারুইনের সহচররা তখন ওদের ডিম কুড়িয়ে এনে ইনকিউবিটারের তাপে রাখলেন।

: আমরাও এ দ্বীপের সবুজ কাছিমদের ডিম সংরক্ষণ করবো।

: ডারুইন সেখানে রক্তচোষা চড়ুই পাখির খোঁজ পেয়েছিলেন। রক্তচোষা চড়ুই অন্য পাখির পিঠে চড়ে ওদের পালকের গোড়ায় ঠোঁট ঢুকিয়ে রক্ত চুষে খায়।

দূর থেকে কুক্কা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ফয়সাল এগিয়ে আসে।

: জেলেপাড়ায় ডুগং মারার উৎসব দেখতে এখুনি যাবো। আকরাম, ক্যামেরা নিয়ে নাও। লিপনের দায়িত্ব লাইটের। সবাই তৈরি হয়ে নেয়। আশরাফের শরীরটা ভালো লাগছে না। সে যেতে চায় না। ওর শরীরে কেমন লাল দাগ ফুলে উঠেছে। আশরাফ তাঁবুতে শুয়ে থাকে। জেলেপাড়া থেকে দু'জন যুবক এসেছে। ওরা আগেই বলে রেখেছিল। পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ওরা চলে যেতেই আশরাফ শুয়ে টেপে গান শুনতে থাকে। নীল তাহিতির গান। সমুদ্রের গর্জনের সাথে মিশে সেই সুর আরো মায়াবী হয়ে ওঠে। আশরাফ যেন দেখতে পাচ্ছে সৈকতের নারকেল বন দুলছে। ঘাসের পোশাক পরে যাচ্ছে মানুষ। মাছ ধরে ফিরছে নৌকা। বড় মালিন ধরে ফিরছে জেলেরা। তালে তালে তারা উল্লাস করছে।

চেরাদিয়া থেকে জিনজিরা যেতে কয়েকটা ছোট খাঁড়ি পেরিয়ে যেতে হয়। দূর থেকে জেলেপাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উৎসব জমে উঠেছে। কয়েকটা মশাল জ্বলছে। ঢোল বাজিয়ে গান হচ্ছে। কয়েকজন যুবক কোমর দুলিয়ে নাচছে। এদের নাচের ভংগীর সাথে মাল দ্বীপের জেলেদের নাচের কিছুটা মিল আছে। ওরা ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতে থাকে। জেলে বউরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। ডুগং এর মাংশ খাচ্ছে জেলেরা। ছবি তোলার আলোতে কখনো ঝলমল করে ওঠে জায়গাটি।

নোনাবনের ভেতর দিয়ে চুপিসারে হেঁটে আসছে কালা শয়তান। ধূর্ত শিয়ালের মতো ছুটে যাচ্ছে। পায়ের নিচ দিয়ে সর সর করে ছোট প্রাণী পালিয়ে যায়। তার হাতের খাঁচায় গিরগিটির মতো একটা প্রাণী। তুয়াতারা। বেনিত্তার দেয়া

প্রাণী। নীল চোখের ছেলেটিকে এই তুয়াতারার থাবা দিয়ে অসার করে দিয়ে আসবে। একবার বিষাক্ত বিছা দিয়ে সম্মোহিত করতে চেষ্টা করেছিল। তখন ঠিকমতো পারেনি। তুয়াতারার হাত থেকে এবার নিস্তার নেই। ছেলেটি অসার হয়ে এলেই তার নীল চোখের মণি খুলে নেবে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁবুটা। আলো জ্বলছে। কালা শয়তান খোঁজ নিয়েছে দলের বাকিরা গেছে জেলেপাড়ায়। তাঁবু থেকে সুর ভেসে আসছে।

জেলেপাড়ায় শুটিং করতে গিয়ে হঠাৎ লিপন দেখে একটা বড় বালব্ সে ভুল করে নিয়ে আসেনি। তাঁবুতেই রেখে এসেছে। উৎসবের আরো কাজ বাকি রয়েছে।

: ফয়সাল, আমি একটু তাঁবুতে যাচ্ছি।

: কেন?

: বড় বালব্টা ফেলে এসেছি।

: চট করে গিয়ে আনতে পারবে?

: পারবো।

: কাউকে সাথে করে নিয়ে যাও।

: লাগবে না।

: এ্যাডভেঞ্চার?

: অনেকটা।

লিপন টর্চটা নিয়ে রওয়ানা হয় ওদের তাঁবুর দিকে। পায়ের নিচে শুকনো শামুকের খোল করকর করে ভেংগে গুড়িয়ে

যায়। মৃদু শিস দিতে দিতে চলেছে লিপন। একলা পথে চলতে গিয়ে শিস দিতে ভালো লাগে। একসারি কড়ুই গাছ পেরিয়ে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে লিপন।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কালা শয়তান। তার কুতকুতে চোখ দুটোতে এখন লোভের ছায়া। কাটাঝোপে লেগে তার শরীর কোথাও ঘষটে গেছে। তুয়াতারা খাঁচার ভেতরে ছটফট করে।

হিমছড়ির দুর্গবাড়ির ঘরে কুষ্টাল বলটির দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছে বেনিত্তা। লাল ফোঁটা এখনো ঘন হয়নি। নীল চোখের ছেলের যখন মণি উপড়ে ফেলা হবে তখন লাল ফোঁটা ঘন হবে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তুয়াতারা এখন শিকারের খুব কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রয়েছে বেনিত্তা।

লিপন ওদের তাঁবুটা দেখতে পায়। চাঁদের আবছা আলোতে দেখে তাঁবুর কাছে একটা ছায়ামূর্তী। আশরাফ না। কে তবে এতো রাতে এখানে? বিপদের গন্ধ পায় লিপন। সে সাবধানে কোন শব্দ না করে এগুতে থাকে। কালা শয়তান যেই

মাত্র তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনি টর্চ জ্বালে লিপন। চমকে ফেরে কালা শয়তান। টর্চের আলোতে তার কুৎসিত মুখটাকে ভয়ংকর দেখায়। একটা চাপা আর্তনাদ করে ওঠে লিপন। কালা শয়তান হিংস্র হয়ে ছুটে আসে লিপনের দিকে। কুংফু কারাতে দক্ষ লিপন নিমেষের মাঝেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। প্রায় উড়ে জোরে এক লাথি ঝেড়ে দেয় কালা শয়তানের বুক লক্ষ্য করে। ছিটকে বালুমাটিতে পড়ে কালা শয়তান। শব্দ শুনে বিছানা থেকে উঠে এসেছে আশরাফ। লিপন এক নাগাড়ে মেরেই চলেছে কালা শয়তানকে। কালা শয়তান তার রহস্যময় অস্ত্রগুলো বের করার সময়ই পাচ্ছে না। লিপনের বুট জুতোর লাথির আঘাতে কালা শয়তানের ডান দিকের গালের অনেকটা অংশ থেঁতলে গেছে। রক্ত মাখামাখি হয়ে মুখটাকে আরো বীভৎস দেখাচ্ছে। কালা শয়তান বুঝতে পেরেছে এখানে টিকতে পারবে না সে। আশরাফ পেছন থেকে এসে কালা শয়তানকে ধরে ফেলে। লিপন এসে মুচড়ে ধরে কালা শয়তানের হাত। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে।

: বল, এখানে কি করতে এসেছিস ?

চুপ করে থাকে কালা শয়তান। লিপন তখন দেশলাই দিয়ে একটা ছোট মশাল জ্বালে।

: আমার কথার জবাব না পেলে আগুনের ছ্যাকা দেব।

লিপনের হাত এগিয়ে আসছে। মশালের আলো দপ দপ করে

জ্বলে। লিপনের মুখে লালাভ আলো। তাকে এখন নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে।

: বল, কে পাঠিয়েছে এখানে ?

মশালের উত্তাপ এসে লাগে কালা শয়তানের মুখে। তার ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখটাতে লাল আলোর ঝিলিক। লিপন হাত মুচড়িয়ে যাচ্ছে। কপালের রগ ফুলে ওঠে কালা শয়তানের। গোঙাতে থাকে সে।

: আমাকে ··আমাকে এখানে পাঠিয়েছে বেনিত্তা।

: সে কে ?

: বিদেশি।

: কোন দেশের ?

: লোকটা পর্তগীজ।

: কোথায় আছে সে ?

: হিমছড়িতে।

: হিমছড়ির কোথায় ?

: দুর্গবাড়িতে।

: তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে কেন ?

চুপ করে থাকে কালা শয়তান। মশালটা এবার তার রক্তাক্ত গালে লাগায়। চিৎকার করে ওঠে কালা শয়তান।

: কেন পাঠিয়েছে ?

: ওকে মারার জন্যে।

হাত তুলে আশরাফকে দেখিয়ে দেয়। চমকে ওঠে আশরাফ।

: কেন? ওকে মারতে চায় কেন?

: কারণ ওর চোখ দুটো নীল।

: তাতে কি হয়েছে? নীল চোখের ছেলে বলে ওকে মারতে হবে কেন?

: ওর চোখের মণি দুটো প্রয়োজন। বেনিত্তার নির্দেশ।

কৃষ্টাল বলের সামনে ঝুঁকে আছে বেনিত্তা। বিপদের আভাস অনুভব করতে পারছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। কালা শয়তান বুঝি ব্যর্থ হচ্ছে। সবুজ কাকটা তখন কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে। পরপর তিনবার। চমকে যায় বেনিত্তা। এর মানে কালা শয়তান বিপদে পড়েছে। এখন তার বিনাশ চাই। তা নাহলে গুপ্তবিদ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে। গোপন রহস্যের কথা ফাঁস হয়ে যাবে।

তাহলে প্রচণ্ড বিপদ। এ অবস্থায় দুতকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। বেনিত্তা তার কালো আলখাল্লার পকেট থেকে একটা সবুজ পাথরের তৈরি ছোট বাজপাখির মূর্তি বের করে। মোমবাতির কাঁপা আলোতে বেনিত্তাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। কালা শয়তান তাকে ডুবিয়ে দিলো। তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। পূবদিকে মুখ করে সেই পাথরের বাজপাখিকে মাটিতে রাখে। হাতে একটা হাতুড়ি তুলে নেয়। তারপর

বাজপাখিটার মূর্তি হাতুড়ির আঘাতে চূর্ন বিচূর্ন হয়ে যায়।

চেরাদিয়ার চরে তখন ঘটছে রহস্যময় এক ঘটনা। হঠাৎ আশরাফ আর লিপন দেখে কোত্থেকে একটা বড় শিলা পাথর উড়ে এসে কালা শয়তানের মাথায় প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। সেই আঘাতে থেঁতলে গুঁড়িয়ে যায় কালা শয়তানের মাথা। নেতিয়ে পড়ে কালা শয়তান। কিছুক্ষনের মধ্যেই ছটফট করতে করতে মারা যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় লিপন আর আশরাফ। হঠাৎ থরথর শব্দ। একপাশে খাঁচার ভেতরে একটা গিরগিটির মতো প্রাণী ছুটোছুটি করছে। তাঁবুর বাইরে দলের বাকিদের গলা শোনা যায়। জেলেপাড়া থেকে লিপনের দেরী দেখে ফিরে এসেছে। ডুগং উৎসবের আর ছবি তোলা হয়নি লাইটের অভাবে। তাঁবুর কাছে আসতেই যে দৃশ্য দেখলো তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল ওরা। একটা মানুষের থেঁতলানো মৃতদেহ পড়ে আছে। সব মিলিয়ে ভয়ংকর এক পরিবেশ।

লিপনের কাছ থেকে সব শুনলো।

রহস্যের ঘন কুয়াশা যেন তাদের চারপাশে ঘনিয়ে ওঠে। পর্তুগীজ লোক বেনিত্তা কি করছে হিমছড়ির দুর্গবাড়িতে? কেন আশরাফের মতো নীল চোখের ছেলেদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়?

: এই মৃতদেহটাকে এখুনি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে হবে।

: কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা হাংগরের খাবার হয়ে যাবে।

ওরা কালা শয়তানের মৃতদেহটাকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় বেলাভূমিতে। যেন এক রহস্যের পথে যাত্রা করছে তারা। চাঁদের আলো ফিকে হয়ে আসছে। কেমন পাঁশুটে ভাব চারদিকে। বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার সময় পথে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা পড়ে। ঢেউতে ভাসিয়ে দেয় মৃতদেহটা। রক্তের গন্ধে এখুনি ছুটে আসবে হিংস্র হাংগরের ঝাঁক। মংডু পাহাড়ের কালা শয়তানের শরীরের মাংশ খুবলে খুবলে নেবে।

পরিশ্রমে সকলের মুখে ঘাম জমেছে। প্রবাল দ্বীপে আসার পর থেকে কম ঘটনা ঘটছেনা। একের পর এক উত্তেজনা। তারের খাঁচার ভেতরে ছটফট করছে গিরগিটি।

: এটা আবার কি?

: ঐ লোকটা সাথে করে এনেছিল।

: এটা কি গালাপাগস দ্বীপের ইগুয়ানা নাকি?

তকি টর্চ জেলে প্রাণীটাকে ভালো করে দেখে।

: এটা হলো তুয়াতারা। মাওরিরা মনে করে মৃত্যুর প্রতীক। তাহিতি দ্বীপ থেকে 'ওয়াহা' চেপে নিউজিল্যাণ্ডে গিয়েছিল আদিবাসী মাওরিরা। তারা পূজো করে এই তুয়াতারাকে। তারা বিশ্বাস করে কোন এক সময়ে এই তুয়াতারা অগ্নিদেবীর বিদ্রোহী নাতিকে হত্যা করে পৃথিবীতে প্রথম মৃত্যু আনে। এর আগে পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কোন কিছু ছিল না। বিজ্ঞা-

নীরা বলছেন কুড়ি কোটি বছর আগে এই জাতের সরীসৃপ ছিল। পৃথিবীর আদিকাল থেকে বুঝি তারা বাস করে আসছে। জীবন্ত ফসিল।

সবাই আগ্রহ ভরে প্রাণীটাকে দেখতে থাকে। কালচে বাদামি। তার উপর লালের ছোপ। মাথার শেষ থেকে পিঠের উপর দিয়ে লেজের প্রায় ডগা কাঁটা কাঁটা চুড়োয় ভরা। পায়ে ধারালো নখরযুক্ত পাঁচটি করে আংগুল। আংগুলগুলো কিছুটা ঝিল্লীযুক্ত। কিন্তু তুয়াতারাকে এখানে সাথে করে আনলো কেন লোকটা? কি তার উদ্দেশ্য ছিল। জীবন্ত ফসিল দিয়ে কি করতে চেয়েছিল? হঠাৎ তকির একটা কথা মনে হয়।

: আমার মনে হয় তুয়াতারা দিয়ে ঐ বেনিত্তা আশরাফকে মারতে চেয়েছিল। বেনিত্তা তাহলে সম্ভবত একজন পিশাচ সাধক।

: পিশাচ সাধক! কি করে বুঝলে?

: এই তুয়াতারাটি দেখে।

: মানে!

: ব্ল্যাক আর্টের উপর এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া বেরিয়েছে। তাতে পড়েছি এক ধরনের পিশাচ সাধক আছে যারা তুয়াতারা দিয়ে মানুষ হত্যা করে। যে মানুষকে ওরা শিকার বলে মনে করে।

: কাল ভোরেই আমাদের যেতে হবে হিমছড়ি। বেনিত্তার খোঁজে।

৯ কালো জাদুর টানে

বেনিত্তা ঝট করে উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারে তার চোখ দুটো সীয়ামিজ বেড়ালের মতো জ্বলে। কুষ্টাল বলে যে কয়েকটা দাগ আড়াআড়ি ভাবে ফুটে উঠেছে তা হিশেব করেছে সে। একটি জায়গা অনুমান করতে পারছে। সেখানেই সিস্তান বাতিস্তার ডাইরিটি থাকার কথা। ঘর থেকে বের হয় বেনিত্তা। বারান্দায় থিকথিকে অন্ধকার। দূরে ঝাউবন বাতাসে দুলছে। লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে নেমে আসে। নিচ তলার বা দিকের ঘরটার কাছে যায়। দরজার আংটা তার দিয়ে বাঁধা। ধীরে ধীরে তার খোলে। এখুনি সময় হয়েছে ডাইরিটি সংগ্রহ করার। সময় না হলে কোন কিছু করা যাবে না। দরজাটা ঠেলতেই ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে আসে। ঢুকে মোমবাতি জ্বালে বেনিত্তা। দেয়ালের একপাশে শয়তানের ছবি ঝুলছে। ছাগলের মতো মুখ। আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে উইচরা উড়ে চলেছে সাবাথের উদ্দেশ্যে। এ ঘরটায় বসে বোধহয় বাতিস্তা প্রেত সাধনা করতো। দেয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে থাকে। এক জায়গায় এসে ঠং করে শব্দ হয়। বোঝা যায় ভেতরটা ফাঁপা। হাতুড়ি

দিয়ে আঘাত করতেই ইট খুলে যায়। কয়েকটা ইট সরাতেই ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গা। মোমবাতিটা তুলে ধরে। ভেতরে ছোট একটা কালো বেড়ালের মূর্তি। চোখ দুটো নীল পাথরের। মূর্তীটা হাতে তুলে নেয়। পেটের কাছে দাগ। একটু চাপ দিলেই দুপাশে খুলে ফেলা যায়। বেড়ালের মূর্তিটা চাপ দিয়ে খুলে ফেলে বেনিত্তা। ভেতরে একটা কাগজ ভাঁজ করা। হলদেটে কাগজ। অনেক দিনের পুরনো। বাতিস্তার লেখা। কম্পিত হাতে কাগজটা খোলে বেনিত্তা। সেখানে লেখা—আমার ডাইরিটি রেখেছি গোপন কুঠুরীর কড়ি কাঠের কাছে। এ ঘরের নিচেই আছে গোপন কুঠুরীতে যাবার রাস্তা।

বেনিত্তা সমস্ত ঘরের মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে হাঁটতে থাকে। কয়েকটা চামচিকে উড়ে যায়। এক কোণায় গিয়ে বুঝতে পারে সেখানে কাঠের কোন পাটাতন রয়েছে। পাথরের মেঝে না। খট খট শব্দ হচ্ছে। ময়লা আবর্জনা সরাতেই আংটা দেখা যায়। জংধরা আংটা ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে টান দেয়। আস্তে আস্তে কাঠের মুখটা সরে যায়। মোমবাতির আলোতে দেখা যায় নিচে নেমে যাবার সিঁড়ি। অতীতে পাইরেটসরা এ সিঁড়ি দিয়েই নেমে যেত। অনেককে বন্দী করে রাখতো। নির্মম অত্যাচার করতো। কাটা মাছের চাবুক দিয়ে পিঠ ক্ষতবিক্ষত করতো। কুঠুরীর ভেতর বহু বন্দী তিলে তিলে প্রান দিয়েছে। সিঁড়িতে পা রাখতেই বেনি-

তার শরীরটা কেমন সিরসির করে উঠলো। বন্দীদের প্রেতাত্মাগুলো যেন প্রতিশোধের জন্যে ঘুরছে। এই সিঁড়ি দিয়ে দর্পিত ভাবে নেমে গেছে সিস্তান বাতিস্তা। ক্যাপ্টেন কিডের বন্ধু। দেয়াল হাঁতড়ে নামছে বেনিত্তা। বাতিস্তার চাপা কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছে—

: এসো, এসো। আমার বংশের বাতি জ্বালানো পুরুষ এসো। তোমাদের জন্যেই এতোদিন ধরে আগলে রেখেছি সঞ্চিত ধন রত্ন। কতো জাহাজে হামলা চালিয়ে এসব সংগ্রহ করেছি। এখন তোমাদের তা ভোগ করতে হবে। আমার বাকি বংশধরদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

কয়েকটা আরশোলা ফরফর করে উড়ে গেল। সাবধানে সিড়ি দিয়ে নামতে থাকে বেনিত্তা। গোপন কুঠুরীটি ভ্যাপসা গন্ধে ভরা। এক কোণায় একটি মই। সেটা দিয়ে উঠে কড়ি কাঠের কাছে গিয়ে দেখে কালো মখমল কাপড়ে জড়ানো একটা খাতা। মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা। এটাই তাহলে সিস্তান বাতিস্তার সেই ডাইরি! বেনিত্তা সেটিকে তুলে নেয়। উপরের ঘরে গিয়ে আজ রাতেই পড়তে হবে। পুরনো দিনের অনেক রহস্যের হদিশ তাহলে জানা যাবে। আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে বেনিত্তা। রাতচরা কয়েকটা পাখি ডাকে। দুর্গবাড়ির পেছনের ঘাসবনে ঢেকে থাকা কবরখানায় তখন অদ্ভুত রকমের এক জন্তুকে দেখা যায় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে। অন্ধকারে জন্তুটার লাল চোখ জ্বলে। রক্ত চোষার

ঘুম ভাংগে। ছোট ছোট প্রাণীদের ধরে খায়। মোমবাতির আলোতে বেনিত্তা ডাইরির পাতা উল্টে যায়। ১৬৯৫ সাল থেকে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে লেখা।

সমুদ্র এখন একঘেঁয়ে লাগছে। অনেক দিন কোন জাহাজ দেখি না। নোনা মাংশ খাচ্ছি। এবার প্রচুর বুনো মহিষের লবণ মাখানো মাংশ সংগ্রহ করেছিলাম। এক দ্বীপে নেমে প্রচুর খাসী পাখি মেরেছি। বেশ ক'মাস চলে যাবে। মাংশে স্বাদ আছে।

কতো আর ভাল্লাগে এভাবে উত্তেজনাহীন ভাবে ভেসে যাওয়া। মাস্তুলের কাছে 'কাকের বাসা'য় বসে থাকা লোকটা বিকেলের দিকে চেঁচিয়ে উঠলো—জাহাজ, জাহাজ বলে। শুনে শরীরের ভেতরে বুনো উল্লাস ছড়িয়ে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই জাহাজের ওপর। মালাক্কা থেকে দামী মশলা নিয়ে ফিরছিল। জাহাজে বেশ কটি ধনী পরিবার আছে। এদের প্রত্যেকের সাথে থাকে দামী পাথরভরা বাক্স। সহজে দিতে চায় না। অনেককে হত্যা করতে হলো। তরোয়ালের কোপে একটানে অনেকের মাথা নামিয়ে ফেললাম। একটা কিশোরী মেয়ে কাঁদছিল। ওর সামনেই ওর বাবাকে হত্যা করেছি। তাজা রক্ত দেখতে আমার ভালো লাগে। কিশোরীর কান্না আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বল করে ফেলেছিল। এবার

অনেক রত্নপাথর পেলাম।

পিয়েত্রা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কয়েকটা পাথরের বাকসো লুকিয়ে রেখেছিল। আমার দীর্ঘ দিনের সহচর পিয়েত্রা। তবু তাকে ক্ষমা করলাম না। ডেকে এনে সবার সামনে মাস্তুলে বেধে তরোয়াল দিয়ে ওর শরীরটা চিরে দিলাম। মৃত্যুর আগে পিয়েত্রা প্রানে বাঁচার জন্যে খুব কাকুতি মিনতি করছিল। আমি মোটেই দমে যাইনি। ওকে হত্যা করতে আমার হাত একটুও কাঁপেনি। সবাই দেখুক বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি। এমন না করলে দল চালানো যাবে না।

—ক্যাপ্টেন কিডের সাথে দেখা। বাহামাতে। অনেক তার নাম শুনেছি। সমুদ্রে সে অনেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার জাহাজের নাম অ্যাডভেঞ্চার। এটা স্বয়ং রাজার জাহাজ। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম তাকে ফরমান দিয়েছে। সেখানে লেখা—'আজ থেকে আমার ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজ অ্যাডভেঞ্চারের ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। নতুন পৃথিবীর (আমেরিকা) সঙ্গে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের তুমি নির্মূল করবে এই আমার আদেশ। সমুদ্রে

ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য কিছুতেই খর্ব হতে দেয়া চলবে না।'

কিড প্রথমে রাজার প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু ক্রমে সে দুঃসাহসী পাইরেটে পরিণত হলো। লোকে তাকে বলতো সমুদ্রের আতংক। জাহাজ থেকে রাজকীয় পতাকা নামিয়ে জলদস্যুদের করোটি চিহ্নের কালো পতাকা মাস্তুলের চূড়ায় তুললো। ক্যাপ্টেন কিডের কথা শুনেছিলাম বহুদিন। তার সদর দফতর হলো বাহামার একটি দ্বীপ। সমুদ্রের অভিযানের পর ঐ দ্বীপে ফিরে গিয়ে সম্পদ ভাগ করতো। সম্পদের কুড়ি ভাগ ছিল ক্যাপ্টেন কিডের। বাকিটা নাবিকদের ভেতরে সমান ভাবে ভাগ করে দেয়া হতো।

আমার সাথে কিড অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছিল। আমি তার কোন ক্ষতি করিনি। আমার খুব কৌতূহল ছিল তার সম্পর্কে। তাই দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাহামা দ্বীপে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটালাম।

বাহামা দ্বীপে আমি দেখি নীলনয়না অ্যানিকে। তাকে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আমি তার পরিচয় জানতে চাই।

কিড জানায় কি ভাবে তারা একবার একটা স্পেন দেশীয় বাণিজ্য জাহাজকে তাড়া করে। কামান দেগে সেই জাহাজের ক্ষতি করে। লড়াই হয়েছিল সামান্য। স্পেনীয় জাহাজে ছিল আশি হাজার রৌপ্যমুদ্রা, চারটি বড় বড় আধারপূর্ণ রত্নালঙ্কার, বড় বড় সিন্দুক ভর্তি সূক্ষ বস্ত্রসম্ভার। সেখানেই

দেখা পায় অ্যানির। কিড তার ফাঁদে পা দিলো।

কিডের গলায় সবসময় ঝুলে থাকতো সোনার এক হার। সেই হারে লকেটের মত একটা ছোট থলি ঝুলত। এর মধ্যে তার ধনরত্নের নকশাটা গোপনে রাখা ছিল। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট্ট দ্বীপের অজানা জায়গার প্রায় শ'খানেক জাহাজের লুণ্ঠিত সম্পদ সে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। একটি মাত্র নকশাই ছিল কিডের কাছে। লুকানো ধনরত্নের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে বারজন হতভাগ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন কিড কাউকে ক্ষমা করে না।

নকশায় ছিল গুহায় যাবার নির্দেশ। যে গুহার ভেতরে লুকানো আছে দুশ ষোলটি সিন্দুক ভর্তি হীরে, চুনি, মুক্তো আর সোনা। অ্যানি অনেক ছলাকলা করেছিল কিডের সম্পদ নেবার জন্যে। সফল হয় নি।

—তিমি শিকারী একটি জাহাজে করে মূল্যবান সম্পদ পাচার হচ্ছে বলে এক খবর পেলাম। নীল তিমি শিকার করে এসব জাহাজ। মূল্যবান সম্পদ হলো পেরুর রাজাদের সম্পদ। খবরটা পেলাম গোপনে। বন্দর থেকে আরো জানতে পারলাম তিমি শিকারী সেই জাহাজটা 'সম্মোহক' দ্বীপে কয়েকদিন থাকবে। সেই নির্জন দ্বীপে সাধারণত: কেউ যায় না। লোকে বলে ইনকা প্রধান টোপা জুপানকুই ভেলা নিয়ে প্রথম এ

দ্বীপে গিয়েছিল। আমরা হিশেব করে দেখলাম নীল তিমি শিকারী জাহাজ এসে পৌঁছাবার আগেই আমরা সেই 'সম্মোহক' দ্বীপে গিয়ে গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারবো।

'সম্মোহক' দ্বীপে আগে আর আসিনি। অদ্ভুত লাগলো। বড় বড় সব কাছিম। আজব সব প্রাণী। ক্যাকটাস ঝোপে গিরগিটি। কোন কোন গিরগিটির নাক দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে। বালির খোঁদলের মধ্যে অদ্ভুত এক গিরগিটি দেখলাম। বালির রংয়ের সংগে সেটা একদম মিশে ছিল। সমস্ত গা তার ডুমো ডুমো গুটিকায় ভরা। প্রতিটি গুটিকার উপর একটি করে ক্যাকটাসের কাঁটার মতো কাঁটা। তার ঐ রূপ দেখে আমার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। পরে ঐ রকম মূর্তি দেখি হাইতরু দ্বীপের ভুডুদের কাছে। যাদের কাছে আমার কালো জাদু শেখার হাতে খড়ি। ঐ রকম গিরগিটির নাম পাহাড়ী শয়তান। অনেক কদাকার চেহারার সরীসৃপ আছে এ দ্বীপে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ছোট খাটো ড্রাগন। চারচোখা মাছ দেখলাম এ সাগরে। একজন নাবিক বললো এ মাছের নাম ব্লেনী। সত্যি, পৃথিবীতে যে কতো বিচিত্র ধরণের পশুপাখি আছে!

দ্বীপগুলোতে প্রচুর মৃত আগ্নেয়গিরি। সবচাইতে লোভনীয় হলো বিশাল কচ্ছপগুলো। এক একটার ওজন কি। দু থেকে পাঁচ মনের মত। নাবিকরা খুব খুশী। পেট ভরে মাংশ খেতে পারছে।

একদিন দেখা গেল নীল তিমি শিকারী জাহাজটিকে। আমরা সবাই লুকিয়ে রয়েছি। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি যে আমরা এভাবে থাকবো। জাহাজ থামিয়ে ওরা যেই মাটিতে নেমেছে অমনি শুরু হলো আমাদের আক্রমণ। ওরা কামান দাগার সময়ও পেল না। সহজেই অনেককে বন্দী করা হলো। যতোটা শুনেছিলাম ততো সম্পদ নেই। পেরুর রাজবংশের এক লোক কয়েক বাক্স সোনা নিয়ে পালাচ্ছে। পেরুর রাজবংশের প্রচুর সোনার কথা শোনা যায়। লোকটি সহজে বাক্স দেবে না। আমার এক সহচরকে হত্যা করলো। আমি লোকটিকে জীবিত রাখতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ওকে দিয়ে আরো সম্পদের খোঁজ নেয়া। কিন্তু লোকটি খুব বন্য স্বভাবের। আমার এক সহচরকে চোখের সামনেই কয়েক টুকরো করে ফেলা হলো। তার পরিণতিও হলো তাই।

সিস্তান বাতিস্তার ডাইরি পড়তে পড়তে বেনিত্তার মনে হয় পালতোলা জাহাজের ডেক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত। লাল স্রোত। বাতাস কেটে সাঁই সাঁই করে নেমে আসছে তলোয়ারের কোপ। ছিটকে যাচ্ছে মাথা। আগুন জ্বলছে জাহাজে। মানুষের আর্তনাদ। পাইরেটসদের অট্টহাসি। পড়তে পড়তে কেমন উত্তেজিত হয়ে যায় বেনিত্তা। সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে কতো সম্পদ জমিয়েছে বাতিস্তা। কোথায় তার হদিশ। পাতা উল্টে যায়।

বোঝা যায় কালো জাদুর প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে সিস্তান বাতিস্তা। এক জায়গায় লেখা

—বন্দরটি ছোট। শীতের ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে। একটি সরাইখানায় বসে ঝলশানো মাংশ খাচ্ছি। মৃদু আলো। এক মোটা গায়ক কেমন গাল ফুলিয়ে গান গাইছে। একটি লোক কোণার টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করছিল। লোকটির মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। এক সময় উঠে আমার টেবিলে এসে বসে। সাধারণত আমার সামনে কেউ বসতে সাহস পায়না। লোকটি আমার জন্যে পাহাড়ি তিতিরের মাংশ আনতে বলে। তিতিরের ধোঁয়া ওঠা মাংশ প্লেট ভরে এলে লোকটি তার পকেট থেকে একটি কালো বোতল বের করে। ছিপিটা খুলতেই একটা আচ্ছন্ন করার মত গন্ধ। সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন গন্ধটা মিষ্টি এক কাঁপুনি তুলে ছড়িয়ে গেল। লোকটি এবার বোতল থেকে এক ধরনের ঘন রস মাংশের উপর ছড়িয়ে দেয়। তিতিরের মাংশের ওপর বাদামি একটি আবরণ পড়ে। আমি একটু দ্বিধা করছি দেখে লোকটি জানায় ভয়ের কিছু নেই। এ রস হাইতুরু দ্বীপের এক বুনো ফল থেকে তৈরি হয়েছে। এটা খেলে ভালো লাগবে। অন্যরকম লাগবে।

খেলাম। লোকটির সাথে বন্ধুত্ব হলো। ও জানালো আমার চেহারা দেখে সে আমার কাছে এসেছে। আমার ভেতরে নাকি কালো জাদু চর্চা করার ক্ষমতা রয়েছে। এই শব্দটা

আমি কিছু কিছু শুনেছিলাম। কালো জাদু। শব্দটা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করলো। এতে শয়তানের উপাসনা করতে হয়। অনেকে বলে প্রেততত্ব। এটি একটি শাস্ত্র। ভয়াবহ এবং রহস্যময় এক শাস্ত্র। এতে শয়তানকে সর্ব শক্তিমান হিশেবে পুজো করতে হয়।

লোকটি আমাকে বললো—এ পৃথিবীতে অনেক গোপন রহস্য রয়েছে। সাধারণ মানুষ সেসব জানে না। বোঝে না। অথচ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের সামনে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। কালো জাদুর চর্চা করলে এমন এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাবে যখন ক্ষমতা যাবে অনেক বেড়ে। আমার ভেতরে নাকি সেই শক্তি লুকিয়ে রয়েছে।

ঠিকই বলেছে লোকটি। আমার মনের কথা বলেছে। আমি ক্ষমতা চাই। প্রচণ্ড ক্ষমতা। ক্যাপ্টেন কিড আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিল—এতো সম্পদ তার কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভয় কেউ বুঝি সেসব ছিনিয়ে নেবে। তাকে বিষ মেশানো খাবার দেবে। লুকিয়ে থাকবে হত্যা করার জন্যে।

আমি যদি কালো জাদুর চর্চা করি তবে আমার আর কোন ভয় থাকবে না। প্রেততত্বের চর্চা করে অনেক ক্ষমতা পাবো। আমার এতো দিনকার জমানো ধন সম্পদ তখন রক্ষা করা সহজ হবে।

লোকটি বললো—শয়তান উপাসনার জন্যে প্রয়োজন খুব নির্জন কোন প্রান্তর। আমাদের যেতে হবে হাইতুরু দ্বীপের ভুডু

গুণীনের কাছে।

ইংরেজরা পাইরেটসদের সম্মান করতে জানে। ক্যাপ্টেন কিডের কাছে অনেক কাহিনী শুনেছি। সোনা রূপা ও বহু-মূল্য রত্নের জিনিশপত্র লুঠ করে নিয়ে যাবার পর তার একটা বড় অংশ পেত দেশের রাজা। দেশবাসীরা তাই অনেক সময় সমর্থন করতো তাদের। পাইরেটসদের নেতাকে দেয়া হতো বীরের মর্যাদা।

তারা এভাবে রাজার অনুগ্রহে বিদেশি জাহাজ লুণ্ঠন করতো। বিদেশি উপনিবেশ আক্রমণ করতো। রত্ন ভাণ্ডার নিয়ে দেশে ফিরতো। রাজকোষে একটা মোটা অংশ জমা দিতো। তাদের বলা হতো প্রাইভেটিয়ার্স।

রাণী প্রথম এলিজাবেথ এদের খুব মদদ দিতো। তাঁর কোষাগার ভরে উঠেছিল এদের ধন সম্পদে।

ফ্রান্সিস ড্রেকের জাহাজের নাম গোল্ডেন হাইণ্ড। তিন বছর পর মাল বোঝাই করে ফিরেছে জাহাজ। ১৫৭৯ সালে। সমুদ্র থেকে সে দখল করেছিল একটি বাণিজ্য জাহাজ কাকাফুগো। তেরটা বড় বড় সিন্দুক ভর্তি জহরত, সোনা ও রূপোর রেকাবি, কাঁচা সোনা এবং ছাব্বিশ টন রূপো ছিলো ঐ জাহাজে।

ড্রেক যখন পৌছালো তখন ইংরেজরা সেই বীরকে অভ্যর্থনা

জানাতে ছুটে গিয়েছিল জাহাজঘাটায়।

প্রথমে রাণী এলিজাবেথ কোন দূত পাঠাননি। ড্রেক প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন পাঠালো। রাণীকে জানালো এটা হলো প্রথম দফা। পরে আরো আসছে। এক বছরে সমস্ত দেশের খাজনা থেকে রাণীর কোষাগারে যে পরিমাণ অর্থ জমা পড়তো তার দ্বিগুন ছিল সেই উপঢৌকনের মুল্য। এরপর স্বয়ং রাণী এলেন ড্রেকের জাহাজে। নাইট উপাধিতে তাকে ভূষিত করলেন।

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা হলেন জেমস। তিনি ছিলেন প্রাইভেটিয়ার্সদের প্রতি বিরূপ। তারা তখন বন্দরে ঠাঁই পেত না। বাধ্য হয়ে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে গাড়লো ঘাঁটি। বুনো পশু শিকার করতো। খোলা আকাশের নিচে মাংশ ঝলসে নিয়ে খেত। অগ্নিকুণ্ড তৈরি করতো। সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝলসানো হতো বুনো জন্তুর মাংশ। ঐ ধরনের আগুনকে স্পেনীশ ইণ্ডিয়ানরা বলতো বুক্যার্ণ। তাই তাদের নাম হলো বুক্যানিয়ার্স।

হিমছড়ির দুর্গবাড়িতে রাত গভীর হয়। হঠাৎ নীরবতা ভেংগে পেঁচা ডাকে। ঝাউবনে সোঁ সোঁ বাতাস। যেন প্রেতের দীর্ঘশ্বাস পাতার ভেতরে বয়ে যাচ্ছে। মোমবাতির আলোতে

পুরনো হলদেটে কাগজের ওপর খুদে খুদে অক্ষরে লেখা বাতিস্তার কথা। বিভিন্ন বন্দর থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। তাঁর একটি নেশা ছিল বিভিন্ন সমুদ্রের পাইরেটসদের ব্যাপারে জানা। অতীতের কোন ঘটনার কথা খোঁজা। বন্দরের সরাইখানা গুলোতে নাবিকেরা এসব গল্প করে। সহজেই বোঝা যায় সিস্তান বাতিস্তার একটি লেখার মন ছিলো। ভাবতে অবশ্য অবাক লাগে। যে হাত তলোয়ারের কোপে মানুষ কাটে সে হাতই আবার পালকের কলম নিয়ে লিখছে। বেনিত্তা হারিয়ে যায় সেই ডাইরীর ধূসর, বিবর্ণ পাতায়।

ক্যাপ্টেন কিডের জাহাজের নাম অ্যাডভেঞ্চার গ্যালি। তাতে তিরিশটা কামান বসানো। কিড আমাকে বলেছিল ধন রত্নকে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখতে। আমি রেখেছি। তার নকশাটি রেখেছি কালো বেড়ালের মূর্তির ভেতরের ফাঁপা অংশে। মূর্তিটি আমাকে দিয়েছে গুনীন ভুডু।
ডাইরির এটুকু অংশ পড়ে চমকে যায় বেনিত্তা। কোথায় আছে সেই কালো বেড়ালের মূর্তি।

সিস্তান বাতিস্তার বিভিন্ন নকশা লুকিয়ে রাখার পেছনে কালো বেড়ালের মূর্তির সম্পর্ক আছে। এই ডাইরিটির হদিশ পেয়েছিল আরেক কালো বেড়ালের মূর্তির ভেতরে। বেনিত্তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই এই ডাইরির কোথাও উল্লেখ থাকবে সেই পাথরের তৈরি কালো বেড়ালের। পাতা উল্টে যায় বেনিত্তা। বাতিস্তার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা।

একবার দেখলাম ব্লাক বিয়ার্ড টিচকে। তার ছিলো লম্বা কুচকুচে কালো দাড়ি। রঙিন ফিতে দিয়ে সেই দাড়িতে বাধতো বিনুনি। আর তার ফাঁকে ফাঁকে আটকে দিতো অল্প অল্প জ্বলছে এমন বারুদে কাঠি।

এরপর কয়েকটি পাতায় কালো জাদুর স্কেচ আঁকা।

আমি জেনেছি এলিজাবেথ বাথোরীর কথা। তাঁর ছিলো দুধে আলতায় মেশানো রং। মায়াবী রূপসী। ১৫৬০ সালে হলো কাউন্টেস। হাংগেরীর মেয়ে। তাঁর ছিলো পাথরের প্রাসাদ। স্বামী কাউন্ট ফেরেঞ্চ নাদাস্তি। এলিজাবেথ বাথোরী কালো জাদুর চর্চা করতো। তার ধাত্রী ছিলো জোনেস উজভ্যারী। সে জানতো ডাকিনী বিদ্যা। বাথোরী ছিলো রক্তপায়ী। কিশোরীদের দুর্গে ধরে এনে তাদের হত্যা করে সেই রক্তে স্নান করতো।

যেতে হবে হাইতুরু দ্বীপে। সেখানে থাকে ভুডু গুণীনরা। তারা কালো জাদু বিদ্যায় দক্ষ। আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে টোপাজ মাতামি। লোকটির বাড়ি তাহিতি। এক বন্দরের সরাইখানায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিতিরের ঝলসানো মাংশের সাথে আমাকে সে পাহাড়ি ফলের রস মিশিয়ে খেতে দিয়েছিল। আশ্চর্য লোক টোপাজ মাতামি। আমি ওকে আমার সাথে জাহাজে নিয়েছি। তার কাছ থেকে

আমি জাদু বিদ্যার জ্ঞান শিখছি। ইতিহাস শিখছি। এ যেন এক নতুন পৃথিবী আমার কাছে।

অরিগনেসিয়ার গুহাতে আছে মুখোশ পরা মানুষের ছবি। সেই মানুষের আংগুল কাটা। মৃত্যুকে এড়াবার জন্যে তখন আংগুলের প্রথম গিঁট পর্যন্ত কেটে ফেলা হতো। এটা জাদু বিশ্বাস। কোন গুহা চিত্রে দেখানো হয়েছে মানুষ শিংঅলা হরিণের মুখোশ পরে আছে। ডাইনী চিকিৎসকেরা চিকিৎসার সময় শিং ধারণ করে।

প্রাচীন পারস্যে ছিল মাজিয়ান ধর্মের লোক। জোরোয়াস্তার এ ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই মাজিরা ছিল পুরোহিত। তারা শিশু ও পশু বলি দিয়ে দেহশুদ্ধ রক্ত উৎসর্গ করতো।

আসিরিয়াতে একটি প্রাচীন ছবি কাহিনী পাওয়া যায়। তাতে দেখানো হয়েছে, দেবতারা মিলিত হয়েছেন একটি সম্মিলনীতে। তখন তারা নিজেদের মাঝখানে একটি কাপড় রাখলেন। এবং তাদের প্রথম সন্তান মার্দুকের উদ্দেশ্যে বললেন,

: হে প্রভু, সৃষ্টি বা ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে তোমার ভাগ্য দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করুক। তুমি কথা বল এবং তোমার আদেশ পালিত হবে। তুমি আদেশ কর এবং এই কাপড়টি অদৃশ্য হয়ে যাক। পুনর্বার আদেশ দাও, কাপড়টি ফিরে আসবে।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টে 'যাত্রাপুস্তকে' আছে—'তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার হস্তে ওখানি কি? তিনি বলিলেন, যষ্টি।

তখন তিনি কহিলেন, উহা ভূমিতে ফেল। পরে তিনি ভূমিতে ফেলিলে তাহা সাপ হইল। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন —হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লেজ ধর।—তাহাতে তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া উহা ধরিলে উহা তাহার হস্তে যষ্টি হইল।..... পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে আরও কহিলেন, তুমি তোমার হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও। তিনি আবার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন, পরে তাহা বাহির করিলে দেখ, তাঁহার হাত হিমের ন্যায় কুষ্ঠযুক্ত হইয়াছে। পরে তিনি কহিলেন, 'তোমার হস্ত আবার বক্ষঃস্থলে দেও।' তিনি আবার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন, পরে বক্ষঃস্থল হইতে হস্ত বাহির করিলে দেখ, তাহা পুনরায় তাঁহার মাংশের ন্যায় হইল। .....তুমি নদীর কিছু পানি লইয়া শুস্ক ভূমিতে ঢালিয়া দিও, তাহাতে তুমি নদী হইতে যে পানি তুলিবে, তাহা শুস্ক ভূমিতে রক্ত হইয়া যাইবে।'

আসিরিয়াতে এক ধরনের লোক ছিল। যাদের বলা হতো বারু পুরোহিত। তাদের কাজ নিহত প্রাণীর যকৃৎ ও নাড়ি ভুড়ি দেখে ভবিষ্যৎ গননা করা। এরা পাখিদের উড্ডয়ন দেখেও ভবিষ্যতে কি হবে তা স্থির করতো।

বেজাম্পং (মাথায় ঝুঁটিঅলা পাখি) পাখিকে সত্যি সত্যি মানুষ বলে মনে করে ইবানরা। চিলের বয়োজ্যেষ্ঠ জামাই কেতুপংয়ের মধ্যে একজন সত্যিকারের নেতার সব রকম গুণ আছে। বেরাগাই হলো সবচেয়ে সুখী পাখি, কেননা সে ইবানদের মতই হাসতে পারে। এসব পাখিদের মধ্যে যারা

মানুষকে সতর্ক করে দেয় তারা হল কেতুপংয়ের আত্মীয় কেকিহ পাখি, পাপাউদের আত্মীয় সেনাবং পাখি এবং পাংকাসদের আত্মীয় কুতক পাখি।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে জাদু বিদ্যার জন্যে তিন রকম মন্ত্র প্রচলিত ছিল। সুরপু, মাকলু ও উতুক্কু।

ইহুদী ঐন্দ্রজালিকেরা বাস্পস্থানের মাধ্যমে বলি দিয়ে অতি-প্রাকৃত শক্তিকে বশ করতে চাইতো। সাত বছরের একটি বালককে এই ক্রিয়ার জন্যে নির্বাচিত করতো। সেই বালকের দুহাতে মাখানো হতো জলপাইয়ের তেল। এবং তার তালুতে রাখা হতো একটি স্ফটিক। ঐন্দ্রজালিক বসতো বালকটির মুখোমুখি। তারপর বলতো, 'অঞ্জিল, দেবদূত বাহিনীর ঈশ্বর আলপগা ও আইদুর নামে অনুরোধ করছি যেন তুমি তিন ফেরেশতার এক জনকে পাঠিয়ে দাও।' বালকটি এরপর অবশ্য একটি মানবাকৃতির মত মূর্তি দেখতে পাবে।

ইহুদীদের মধ্যে কিসাপ নামে এক ধরনের জাদুর জনপ্রিয়তা ছিল। এই জাদুর সাহায্যে ডাইনী ও ঐন্দ্রজালিকেরা নিজে-দেরকে যে কোন জন্তু জানোয়ারের মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে পারতো। মুহূর্তের মধ্যে দেশ দেশান্তর পার হয়ে তারা অলৌকিক কাণ্ড কারখানা ঘটাতো। কিসাপের সাহায্যে বিশ্বাস করতো মৃতের আত্মার মাধ্যমে ভবিষ্যৎবানী করা যায়। তখন ঐন্দ্রজা-লিকেরা কবরস্থানে নিশিযাপন করে। বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করে। জ্যোৎস্নালোকে ব্যক্তিবিশেষের ছায়া দেখেও ইহুদিরা

মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনে কি কি ঘটবে, তা বলে দিতে পারতো।

রোমানদের জাদুতে ছিল রক্তের প্রভাব। মারস য়ের মাঠে রথ প্রতিযোগিতার পর ঘোড়া বলি দেয়া হত। ঘোড়ার লেজটিকে রক্তরঞ্জিত করে তা দেবী 'রেজিয়া'র বেদীতে স্থাপন করা হত। ঘোড়াটির রক্ত পরে ভেষ্টা মন্দিরে পরবর্তী উৎসব পর্যন্ত রক্ষিত হত। রোমান গুণিকরা রাতের বেলা গর্ত খুঁড়ে জন্তু জানোয়ারের রক্ত রক্ষা করতো। এরপর তারা মন্ত্রোচ্চারণ করে ডাকতো সমস্ত অপদেবতাদের। রক্ত ভোজে অংশ নেবার জন্যে। সে সময় নরবলি হতো।

সম্রাট নীরোর আমলে শোনা যেত রোমান সাম্রাজ্যের এখানে ওখানে 'অর্ধ জন্তু অর্ধ মানব' জন্মগ্রহণ করছে। বিশ্বাস করা হতো রক্তপায়ী প্রেতাত্মার জন্যে এমন ঘটছে।

ভ্যাম্পায়ারের কোন ছায়া নেই। আয়নার সামনে দাঁড়ালেও তার কোন প্রতিফলন পড়বে না।

ভ্যাম্পায়ার কফিনে শুয়ে শুয়ে নিজের হাত পা থেকে রক্ত চুষে খায়।

প্রতিটি ঐন্দ্রজালিক শয়তান বা ডেভিলের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। রোমের বিখ্যাত ব্যক্তি এগ্রিপ্পা। তার ছিল বিশাল দৈত্যাকায় কালো এক কুকুর। যেখানেই যেত এগ্রিপ্পা, কুকুরটি তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। মৃত্যুর আগে তিনি শয়তান সদৃশ সেই কুকুরটির গলা থেকে

খুলে নিলেন লোহার পিনের গলা বন্ধনী। কুকুরটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অভিশপ্ত প্রাণী, বিদায় হও।' একটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কুকুরটি হারিয়ে গেল চিরতরে।

যোহান রোসা ছিল নামকরা এক ঐন্দ্রজালিক। যিনি মন্ত্রপূত আংটিতে বশ করে রেখেছিলেন একটি প্রেতাত্মাকে। একে দিয়ে তিনি সবরকম কাজ করাতে পারতেন।

মানুষের হাড় তখন জাদু বিদ্যায় ব্যবহার করা হতো। কবরখানা থেকে তোলা হতো শবদেহ।

বলা হতো যদি অমাবস্যার রাতে রাস্তার তেমাথার মোড়ে ঘোড়ার নাল পাওয়া যায়, তাহলে তাই দিয়ে আংটি তৈরি করে পরলে ভগ্ন স্বাস্থ্য ভালো হয়।

ইহুদি ধর্মের গোপন শিক্ষায় আছে অদ্ভুত, রহস্যময় এক যন্ত্রের কথা। কাব্বালা। মানুষের মতো যার গুণাবলী। জাদুকরেরা প্রাচীন পুথিকে করে তুলেছিলেন রহস্যময়। সেখানেই রয়েছে কাব্বালার কথা।

—কাব্বালার ছিল দুটি খুলি। একটির ওপরে আর একটি। দুটিকে ঘিরে ছিল আর একটি খুলি। ওপরকার খুলিতে ছিল ওপরকার মস্তিস্ক। তার ভেতরে হত শিশিরের পাতন। নিচের মস্তিস্কে থাকতো স্বর্গীয় তেল। প্রাচীনের চোখ ছিল চারটে। তাদের একটি জ্বলজ্বল করতো ভেতর থেকে। বাকি তিনটি স্বয়ংপ্রভ ছিল না। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে তাদের দেখাতো কালো, হলদে আর লাল। প্রাচীনের মুখের মতন

মানানসই ছিল তার চাপ দাড়ি। তের রকম বিভিন্ন ধারায়। তার চুলগুলিকে মনে হত যেন গাল থেকে গজিয়ে গালেই ঢুকে গেছে। সেগুলি ছিল নরোম আর তার ভেতর দিয়ে বয়ে যেত তরল তেল।
খুলি ছিল সুকঠিন। তার একদিকে জ্বলতো আগুন আর এক-দিক দিয়ে বের হতো হাওয়া। ওপরের খুলি থেকে তেল বয়ে যেত নিচের খুলিতে আর সেখানে পৌঁছে শাদা তেলের রং বদলে হতো লাল।

বেনিস্তা কাব্বালার ব্যাপারটা পড়ে তেমন কিছু বুঝতে পারলো না। ডাইরি থেকে বোঝা যাচ্ছে মাতামির সাথে পরিচয়ের পর থেকে ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে সিস্তার বাতিস্তা। হাইতুরু দ্বীপে গিয়ে হলো পিশাচ সাধক।
ডাইরির পাতায় হাইতুরুর বর্ণনা।

দ্বীপ হাইতুরু আমাকে ডাকছে। অনেক রহস্য সেখানে। আমরা থাকবো ঘাসের কুটিরে। বুনো পশুর রক্ত দিয়ে যে ঘরের মেঝে মোছা হবে। পাতার আঁশ দিয়ে তৈরি ডোগু মূর্তি থাকবে ঝুলে। যে গাছের ডালে পাখির বাসা আছে সে ডাল কেটে রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হবে।
মাতামি বলেছে—কয়েকদিন ধরে সেখানে মানা খেতে হবে। মানা হলো চির সবুজ ঝাউগাছের একরকম পরজীবী পোকার

নিঃসৃত রস। পোকাগুলো গাছের ডাল থেকে রস টেনে নেয়। তারই বাড়তি অংশটি স্বচ্ছ ফোঁটার আকারে তাদের গা থেকে বেরিয়ে পড়ে। সেই ফোঁটাগুলিই জমে গিয়ে শাদা গুলির মত হয়ে যায়। পিঁপড়েরা সেই গুলিগুলো তাদের গর্তে নিয়ে যায়।

মাতামি আমাকে বললো আকাকোরের কথা। মঙ্গলালা উপজাতির গল্প। সেখানে বলা হয়েছে—দেবতারা শাসন করতেন আকাকোর থেকে। তাঁদের জাহাজগুলো উড়ে চলতো পাখির চেয়ে দ্রুত। সে জাহাজের না ছিল হাল, না ছিল পাল, ছিল একটা জাদুপাথর। তারই ভেতর দিয়ে দেখা যেত দূরের সব কিছু। তা সে নদী, পাহাড়, শহর, হ্রদ যাই হোক না কেন। আকাশে যার ছায়া পড়েছে, পৃথিবীতে যা ঘটছে, সব ফুটে উঠতো সেই পাথরের ওপরে ছবির মতন নিখুঁতভাবে।

ডাইরির এ অংশটুকু পড়তে গিয়ে বেনিত্তার মনে হলো কৃষ্টাল বলের কথা। আকাকোরের কথায় যেন রহস্যময় এক পৃথিবীর খবর।

যে ঘরের দেয়াল থেকে অদ্ভুত আলোটা পড়ছিল, সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল স্বচ্ছ পাথরের চারখানা চাঙর। ভয়ে ভয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলাম, তাদের ভেতরে রয়েছে চারটে উদ্ভট জীব। বুক পর্যন্ত ঢাকা একটা তরল পদার্থে শুয়ে আছে তারা। তাদের হাতে পায়ে আছে

ছ'টা করে আংগুল।

এলাম হাইতুরুতে। অজস্র নারকেল গাছ চারদিকে। মাতামি আমাকে নিয়ে গেল ভুডু গুণীনদের গ্রামে। ভুডুর কি ভয়ংকর চেহারা। গুণীন আমাকে গ্রামের মাঝখানের খোলা জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে একটা গাছের ফাঁপা গুঁড়ির সামনে উবু হয়ে বসেছিল বালিকাদের একটি ছোট দল। আমাকে দেখতে পেয়েই কাঠি দিয়ে গাছের গুঁড়িতে ঘা মেরে বিচিত্র এক সুর তুললো। তারপর কাঠের বর্শা নিয়ে শুরু হলো দাপাদাপি করে নাচ।

কুঁড়ের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। মেজেতে পাতা বিরাট একখানা চেটালো পাথর। সে পাথরটাকে ঘিরে কজন লোক আমাকে নিয়ে বসলো। কয়েকটা ছেলেমেয়ে একটা কচি গাছের শেকড় নিয়ে এলো। এক রকম লতার ঝাড় দিয়ে শেকড়গুলোকে ওপর ওপর পরিস্কার করে সেই পাথরের ওপর রাখা হল। তারপর নোড়া দিয়ে ছেঁচতে শুরু করলো শেকড়। ছেঁচতে ছেঁচতে শেকড়গুলো বাদামি রঙের কাদার মত হয়ে গেল। সেই জিনিশ খেতে হলো।

গুণীন আমাকে দেখলো। জ্বলজ্বলে চোখ। বললো, আমাকে নিয়ে যেতে হবে তেমুয়েন দ্বীপে। প্রবাল দ্বীপ। নামটা আমার চেনা। লিসবনে শুনেছিলাম। ১৯৫ সালে পর্তুগীজ পেদ্রো ফের্নান্দীজ দ্য কুইরেজ সেখানে গিয়েছিল। প্রথম

শাদা মানুষের পায়ের ছাপ পড়লো সেখানে। সেখানেই আছে নান মাদোল। রহস্যঘেরা স্থান। প্রাচীন এক ধ্বংস-স্তূপ। ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। সেখানে হবে কালো জাদুর উৎসব। ভুডু গুণীন আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। সাথে মাতামি। নান মাদোলে না গেলে আমার জীবনের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাকি থাকতো।

অদ্ভুত স্থান এই নান মাদোল। পাথরের প্রকাণ্ড অসংখ্য কড়ি চারদিকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় লাভা জমে তৈরি। কড়ি-গুলো সব দশ থেকে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা। ওজন দশ টনেরও বেশি। প্রধান অট্টালিকার দেয়ালে আড়াআড়ি ভাবে সাজানো ১৮২ টা কড়ি। ওখানে খাল আছে, পরিখা আছে, সুরংগ আছে।

কতো গল্প এই নান মাদোলকে নিয়ে। হাজার হাজার বছর আগে বিশাল এক রাজ্যের কেন্দ্র ছিল এখানে। ধন রত্নের লোভে এসেছে অনেকে। ডুবুরিরা সমুদ্রতলে ডুবে অনেক রহস্যময় জিনিশ দেখেছে। উঠে এসে বলেছে অনেক কাহিনী। বলেছে, পানির তলায় রয়েছে চমৎকার পথশ্রেণী। ঝিনুক আর প্রবাল পল্লবে ঢাকা। সেখানে আছে প্রচুর মূল্যবান ধাতু। ভুডু গুণীন আমাকে দীক্ষা দিলো কালো জাদুর। বললো— আমাকে যেতে হবে দূরের দেশ বেংঘোলাতে সেখানকার কোন প্রবাল দ্বীপের কাছে। সেখানেই দুর্গবাড়ি বানিয়ে করতে হবে সাধনা। নীল চোখের ছেলেদের রক্তে স্নান করতে হবে।

আমার গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতে হবে প্রবাল দ্বীপের নিচে। সেই সম্পদের হদিশ গোপনে রাখতে হবে কালো বেড়ালের মূর্তির ভেতরে। আশ্চর্য এক রহস্যে কখনো কখনো জীবন্ত হবে এই মূর্তি। শক্তি সঞ্চারিত হবে তার মাঝে। কিন্তু···একটি বিপদের আশংকা আছে। এক জাহাজডুবিতে এই মূর্তিটি পানির নিচে চলে যাবে।

পড়তে পড়তে শিহরিত হয় বেনিত্তা। সিস্তান বাতিস্তা তাহলে এই নির্দেশেই এসেছিল বেংঘোলা দেশে। হিমছড়িতে দুর্গবাড়ি বানিয়ে করেছিল গোপন সাধনা।

কিন্তু জাহাজডুবিতে কি হারিয়ে গেছে কালো বেড়ালের মূর্তি। কালা শয়তান বলেছিল কয়েকটা ছেলে এসেছে সেন্ট মার্টিনসে। তারা সমুদ্রের নিচে নেমেছিল ডুবুরি হয়ে। তাদের মধ্যে একটি ছেলের চোখ নীল। তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে কালা শয়তান। তার উপযুক্ত শাস্তি সে পেয়েছে।

কি একটা কথা সাঁৎ করে মনে হলো বেনিত্তার। একদিন কৃষ্টাল বলের সামনে বসে সাধনা করছিল। ওর কাছে বলের বুকে আলো আর রেখার কাঁপুনি দেখে মনে হয়েছিল গুপ্তধনের নির্দেশের স্থানে প্রবেশ করেছে কোন শক্তি। তবে কি সেন্ট মার্টিনসের কাছে কোথাও সিস্তান বাতিস্তার জাহাজডুবি হয়েছিল। তার ভেতরে আছে কালো বেড়ালের মূর্তি। তারই সন্ধান পেয়েছে ঐ কিশোর ছেলেগুলো। কৃষ্টাল বলের সঙ্কেত

দেখে মনে হচ্ছিলো স্থানটি কোন তরল স্থানের মতো হবে। উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে থাকে বেনিস্তা। আর দেরী করা যাবে না। কালা শয়তান শেষ হয়েছে। অন্য অশুভ শক্তি দিয়ে নীল চোখের ছেলেদের হত্যা করতে হবে। সিস্তান বাতিস্তার দেহকে জাগিয়ে তোলার জন্যে কবরখানায় গিয়ে শুরু করতে হবে ভয়ংকর প্রেত সাধনা।

১০ অশুভ সংকেত

ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি তখনো। আকাশের রং কচি লেবুপাতার মত। চেরাদিয়া থেকে রওয়ানা দেয় ফয়সাল, তকি, লিপন, আকরাম আর আশরাফ। গত রাতটি ছিল বিভীষিকাময়। ভোরের বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ লাগছে। ঝিরঝিরে বাতাসে ডানা মেলে দিয়েছে সাগর পাখিরা। সাগর কলমীর সতেজ পাতা ছড়িয়ে আছে বালুমাটিতে।

জিনজিরার ঘাটে ইঞ্জিন লাগানো নৌকা তৈরি। আরো কয়েকজন লোক আসে। শুকনো হাংগর নিয়ে একজন ওঠে। ভটভট করে ছেড়ে দেয় নৌকা। ঝকঝক করছে নীল সমুদ্র। হিমছড়ির দুর্গবাড়িতে এসেছে এক রহস্যময় বিদেশি। লোকটি পর্তুগীজ। এ দেশে পর্তুগীজরা হার্মাদ হয়ে এসেছিল।

সমুদ্রে কয়েকটা উড়ুক্কু মাছ লাফ দেয়। ফয়সাল গভীর ভাবে চিন্তা করছে। তকি কাছে এসে বসে।

: এই ফয়সাল, কি এতো ভাবছিস।

: ঐ পর্তুগীজটার কথা। এদ্দিন পর কেন এলো?

: হয়তো বেড়াতে এসেছে।

: অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমার জানতে হবে কেন এসেছে হার্মাদদের এই দূত। আচ্ছা তকি, তোমার কাছে না এদেশে পর্তুগীজদের আসা নিয়ে লেখা একটা বই ছিল।

: আছে।

: কি লেখা আছে তাতে?

সমুদ্র থেকে কখনো পানি ছিটকে আসছে। এই সমুদ্র দিয়ে একদিন ছুটে এসেছিল হিংস্র জলদস্যুরা। পালতোলা জাহাজে করে।

: বংগোপসাগরের সন্দ্বীপে পর্তুগীজরা এক শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করে। সুবেদার ইসলাম খান তখন ঢাকার শাসক। মোগল আমল। আরাকান রাজের সাহায্যে পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাসতিয়ান গনজালেস সেখানকার প্রচুর লোককে হত্যা করে। দাস বানিয়ে রাখে অনেক মানুষকে। সন্দ্বীপে পর্তুগীজ নৌঘাঁটি গড়ে ওঠে। যুদ্ধে তারা পারদর্শী ছিল। নৌশক্তি ছিল। পর্তুগীজ বাহিনীতে ছিল দুইশো অশ্বারোহী। এক হাজার দস্যু। তারা সুলুপ নামের ছিপ নৌকা করে গ্রামে গিয়ে আক্রমন করতো। হিংস্র পর্তুগীজদের সাথে ইসলাম

খান তখন কোনমতেই পেরে উঠছিলেন না।

ফয়সালের মনে হয় সমুদ্রের নিচে কালো কালো ছায়া দেখছে। পর্তুগীজ জলদস্যুরা যেসব জাহাজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তার ছায়া। হার্মাদদের এক বংশধর আবার অনেক দিন পর ফিরে এসেছে হিমছড়িতে। কেন? একসময় বাংলাদেশের সবুজ গ্রামগুলোর আতংক ছিল হার্মাদরা। নীল দরিয়ার বিভীষিকা। তকি বলতে থাকে

: পর্তুগীজরা বাংলাদেশ থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিশেবে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতো। তাদের জাহাজের খোলে রাখতো ফেলে। কাটা মাছের চাবুক দিয়ে মারতো। পালিয়ে যেন যেতে না পারে সে জন্যে হাতের তালুতে ছিদ্র করে করে বেত দিয়ে গেঁথে দিত। শরীরে দিতো আগুনের ছ্যাঁকা।

ফয়সালের চোখের সামনে তখন টিভিতে দেখা রুটস ছবির দৃশ্য ভেসে ওঠে। কালো মানুষদের আর্তনাদ। কান্না। গুঁমড়ে গুঁমড়ে উঠছে।

: এ দেশে কখন থেকে আসতে থাকে পর্তুগীজরা?

: ১৫১৮ সালে জোরা দ্য সিলভীরা নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আসে। তারো আগে জোয়াকোহেল নামে একজন আসে চট্টগ্রামে। তার মাধ্যমে বাংলার সম্পদের খবর পৌঁছে যায় ইউরোপে। ১৬২৬ সালে পর্তুগীজ জলদস্যুরা ঢাকা আক্রমন করেছিল। ঢাকার নাম তখন জাহাংগীর নগর।

তিন দিন ধরে ঢাকায় তাদের লুটতরাজ আর ধ্বংসযজ্ঞ চলে। অনেক এলাকা আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভেংগেচুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় নবাবের প্রাসাদ। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় রাজধানী জাহাংগীর নগর।

এতোদিন পর আবার বুঝি ফিরে এসেছে হার্মাদদের এক প্রেতাত্মা।

বন্দর মোকামে থামে নৌকা। কয়েকজন নেমে যায়। একজন লোক চেঁচিয়ে বলে

: মংডু পাহাড়ের কালা শয়তানের লাশ দেখা গেছে জিনজিরায়।

: কালা শয়তান অনেক ক্ষতি করেছে। বদমাইশ। পোলা-পানেরে ভয় দেখায়। কিন্তু তারে মারলো কে?

: কামটে।

ওরা চুপ করে শোনে। তুয়াতারা দিয়ে আশর ফকে হত্যা করতে এসেছিল কালা শয়তান। আশরাফের চোখ খুবলে তুলে নিত। ওর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়।

আবার নৌকা ছাড়ে। একজন লোক পাশের লোককে বলছে

: হিমছড়ির খবর জানো?

: না।

: সেখানে সন্ধ্যার পর অদ্ভুত এক জন্তুকে দেখা যায়। তার কামড়ে কয়েক জন আহত হয়েছে।

: কি জন্তু?

: কেউ বলতে পারে না। জন্তুটা নাকি থাকে দুর্গবাড়ির

ঘাস বনে।

: ওটাতো রীতিমতো জংগল। ওর ভেতরে লুকিয়ে থাকলে তো জন্তুটাকে ধরাই যাবে না।

হঠাৎ একটা সবুজ কাক উড়ে এসে আশরাফের মাথায় ঠোকর মারে। সাথে সাথে আশরাফের মাথা রক্তে ভিজে যায়। হিংস্র ভাবে ঠোকরাতে থাকে কাকটা। আকরাম হাতের গুপ্তি লাঠিটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে কাকটাকে। তবু কাকটা সহজে নড়তে চায় না। তখন গুপ্তি লাঠির ছুরি বের করে কাকটার শরীর চিরে ফেলে আকরাম। সবুজ কাকটা ডানা ঝাপটে আহত অবস্থায় উড়ে যায়। নৌকার বাকি যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। এমন ধরনের দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি তারা। আশরাফের কপাল গড়িয়ে নামছে রক্তের ধারা। বার বার আক্রমণ হচ্ছে বেচারার ওপর। অশুভ শক্তি বার বার তাকে আঘাত করছে। ফয়সাল তাড়াতাড়ি ফার্স্ট এইডের বাক্স বের করে। ডেটল দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে দেয়।

বিপদের থাবা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আশরাফ ঘাবড়ে গেছে।

: কাকতো নয় উইচ। ডাইনী একটা। আমি কি ভাবে ছুরি চালালাম। অন্য প্রাণী হলে এতোক্ষণ দু'ফাঁক হয়ে যেত। আর এই কাকটা দিব্যি উড়ে গেল।

: তবে ডানা কেটেছে অনেকটা। রক্তও বেরিয়েছে।

নৌকা আবার ছাড়ে। ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর কাটেনি

এখনো। ফয়সাল বিড়বিড় করে বলে

: এখন একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে। অশুভ শক্তির বলয়ে এসে পড়েছি আমরা। চক্র বাড়ছে। ফয়সাল ব্ল্যাক আর্ট পড়া ছেলে। ভালো করে ষ্টাডি করেছে। অনেক কিছু আঁচ করতে পারে।

টেকনাফ দেখা যাচ্ছে। প্রবাল দ্বীপের ভিডিও ছবিটার কাজের যে কি হবে। মাটিতে পা দিতেই ফয়সাল দেখে অদ্ভুত আকৃতির একটা শামুক। পলিনেশীয়ার ভুডুরা এধরনের শামুক চালান করে শত্রুকে বশ করার জন্যে। শামুকটার শরীরে কেমন ডোরাকাটা দাগ। হলুদ কালো। রোদ লেগে চক চক করছে। চায়ের দোকানের সামনে জটলা। কয়েকজন লোক উত্তেজিত হয়ে কি যেন বলছে। ওরা সেখানে গিয়ে শোনে মগপাড়ার একটা ছেলেকে কারা জানি মেরে রেখে গেছে। ওরা লাশটাকে দেখতে যায়। মগপাড়ায় ভিড়। এক মহিলা বিলাপ করে কাঁদছে। পাতার ওপর লাশটা শোয়ানো। ওরা দেখে ছেলেটার চোখের জায়গায় দুটো গর্ত। চোখ দুটো তুলে নেয়া হয়েছে। ফয়সাল কাছে গিয়ে ছেলেটার ডান হাতের দিকে তাকায়। সেখানের তিনটি আংগুল কেটে ফেলা হয়েছে।

১১ রাত্রি যখন পিশাচের

টেকনাফ থেকে জীপে করে হিমছড়ি। বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে জীপ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যায়। দূর থেকে ঝাউবন চোখে পড়ে। হিমছড়িতে বেশি লোক থাকে না। জেলে-পাড়া ছাড়া কয়েকঘর মাত্র লোক থাকে। মগদের একটি ছোট পাড়া আছে। একটা কিয়াং আছে। মগরা ঝিনুকের চমৎকার খেলনা বানায়।

হিমছড়ির সবচাইতে রহস্যময় হলো প্রাচীন দুর্গবাড়িটি। আগাছায়, বুনোলতায় ঢেকে আছে। সহজে সেখানে কেউ যায় না। অনেক গা ছমছমে গল্প ঐ দুর্গবাড়িকে নিয়ে। দুর্গবাড়ির পেছনের জংগলে এক মানুষ সমান শণঘাস।

মগদের বাড়িগুলি মাটি থেকে একটু উঁচুতে। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা বসে চুরুট বানাচ্ছে। কয়েকটা কুকুর ঘুরঘুর করে। ওরা মগপাড়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে যায়। ছোট ছেলে-মেয়েগুলো ছুটোছুটি করছে। লিপনের হঠাৎ মনে হলো সামনের ঘরটার পেছন থেকে একটা মুখ যেন সাঁৎ করে সরে গেল। কদাকার একটি মুখ। ধক করে উঠলো লিপনের বুকটা।

একটা শুকনো মগ কাঠবাদাম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত ভাবে তাদের দেখছে। লোকটার ঘাড়ের কাছ থেকে অনেকটা অংশ ক্ষতবিক্ষত। কেউ যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে। হঠাৎ লিপনের মনে হলো নৌকার ওপর সবুজ কাককে আকরাম গুপ্তি ছুরি দিয়ে আঘাত করছে। কাকটা চিৎকার করে পালাচ্ছে। ছুরির আঘাতে কাকের ডানার কোণায় রক্ত জমে ওঠে। কেন যে এই দৃশ্যটা তখন তার মনে হলো লিপন সেটা বুঝে উঠতে পারলো না।

সেই শুকনো মগটা লিপনকে সামনে দেখে হকচকিয়ে গেছে। কাঠবাদাম গাছ থেকে একটা কাক কর্কশ ভাবে ডেকে ওঠে। মগটা দৌড়ে পালায়। একটা ছেলে ওপাশ থেকে উকিঝুঁকি দিচ্ছে।

: এই লোকটা কে ?

: মাচাং।

: কি করে ?

: ঐ দুর্গবাড়িতে এখন থাকে।

মগটা তাহলে হিমছড়ির রহস্যময় দুর্গবাড়িতে থাকে। কি করে ? ওখানেতো সহজে কেউ যেতে চায় না।

ছেলেটিকে কাছে ডাকে। পকেট থেকে টাকা বের করে দেয়। ছেলেটা খুশি। ওর কাছ থেকে খবর বের করতে হবে।

: ঐ বাড়িতে কবে থেকে থাকে রে লোকটা ?

: এক সাহেব এসেছে ওখানে। তার জন্যে খাবার বানায়।

মাচাং খুব ভালো রান্না জানে।

ওরা সবাই বাইরে অপেক্ষা করছিল। লিপন বেরিয়ে আসে। তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

: কোথায় গিয়েছিলি ?

: একটা লোককে সন্দেহ হলো। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে থাকে ঐ দুর্গবাড়িতে।

জেলেপাড়ায় চাপা আতংক। কয়েকজন জেলে বাইরে বসে আছে। রোদে কাটা মাছ ঝুলছে। দূর থেকে চাপা কান্নার শব্দ আসছে। মন্তার পর আরেকটা ছেলের লাশ পাওয়া গেছে নৌকাতে। ঠিক ঐ রকম চোখ তোলা। একটা খালি ডিঙ্গিতে চিৎ হয়ে ভাসছিল।

কে এভাবে পর পর ছেলেদের চোখের মণি খুবলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কার এমন ভয়ংকর আক্রোশ। ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে জেলেরা। তাদের চোখে মুখে আতংক। মৃত্যুর ছায়া ঘুরছে চারদিকে। গত ক'দিন থেকে সাগরে মাছও তেমন ধরা পড়ছে না। কখনো আবার জালে উঠে আসছে কদাকার বিড়ালমুখো মাছ। যা খাওয়া যায় না। মাছ ধরতে না পারলে পয়সা নেই। ঘরে তখন অভাবের থাবা। ছোট ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় কাঁদে। জেলেপাড়ার ঝুপড়ি গুলোর ওপর দিয়ে নোনা গন্ধের বাতাস বয়ে যায়। ওদের চোখের সামনে বিবর্ণ, বিষণ্ন এক পাড়া। গুমড়ে উঠছে চাপা কান্না।

: শুনলাম, এখানকার একটি ছেলে নাকি মারা গেছে ?

বুড়ো গগন জেলে এগিয়ে আসে। কোটরে বসা তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। বুড়োর শণের মতো শাদা চুল উড়তে থাকে। করাত মাছের আঘাতে পিঠের অনেকটা অংশ জুড়ে শুকনো ক্ষত। চামড়া কুঁচকে আছে।

: গেছে। মস্তা গেছে। পিতি গেছে। আরো যাইবো। অমঙ্গল লাগছে। বুঝলেন ঘোর অমঙ্গল।

বুড়ো গগন জেলে এসে ফয়সালের কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে থাকে।

: বিদেশিরা আসলেই অমঙ্গল লাগে ক্যান ?

একজন যুবক ছুটে এসে বুড়োকে টেনে সরিয়ে নেয়।

: আঃ কি করতাছো গগন খুড়া। মাথা খারাপ হইলো নাকি। এনাগো কি দোষ ?

: দোষ আমাগো কপালের।

চিল চিৎকার করে ওঠে পিতির বাবা। তার একমাত্র সন্তানটা মরেছে।

গগন জেলে সমুদ্রের দিকে হাত তুলে থনথনে গলায় বলে

: খেপছে। সাগর দেও খেপছে। তারে তুমরা ঠিকমতো পুজা দাও নাই। পায়রা বলি কইরা মানত দাও নাই। তারে খুশি করো নাই। আমি কতো কইলাম। ওরে, সাগরের বুকে পায়রা বলি দে। এখন……এখন তার হাত থিকা রক্ষা নাই। জলপায়রা বলি দিয়া শান্ত কর।

সাগর দেও এর কথা শুনে জেলেদের মুখ শুকিয়ে যায়। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। অতল থেকে যেন উঠে আসছে আগুনের লকলকে শিখা। সেই শিখায় ঢেউ উথাল পাথাল। নৌকা ডুবিয়ে দেবে। কামটরা ঝাঁক বেধে ছুটে আসবে কিনারে। পানি রক্তে লাল হয়ে যাবে। মানুষের শরীরের কাটা অংশ ছড়িয়ে থাকবে। জেলেরা ঠিক করে সেদিনই ওরা পূজো দেবে। একজনকে পাঠানো হয় পাহাড়ে। ওখানে থাকে পেথোরা। বন থেকে পাখি ধরে সে আঠালো ডাল দিয়ে। তার কাছ থেকে এক কুড়ি জলপায়রা আনতে হবে।

পাহাড় থেকে মাকুই গাছের পাতা আনতে পাঠানো হয় এক জনকে। এ পাতা দিয়ে তৈরি হবে ভেলা। সাগর দেওকে খুশি না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। পায়রা মেরে পাতার ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয়া হবে। তাতে জ্বলবে প্রদীপ। মৃত পায়রা যাবে সাগরে।

কয়সাল জেলেদের কাছে যায়।

: যে ছেলেটা মারা গেছে তার নাম কি ?

: পিতি।

: পিতির চোখ দুটো কেমন ছিল ?

: মানে ?

: মানে কি রংয়ের ছিল ?

জেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে।

: নীল রংয়ের ছিল কি ?

: হ। হ। নীল রংয়ের ছিল। তাই আমরা কইতাম সাহেব জাউলা।

: পিতিরে। ওরে আমার পিতি।

পিতির বাবা আর্ত চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। ফয়সাল ঠিক করে জেলেদের কাছ থেকে আরো কিছু খবর বের করতে হবে।

: আমাকে এই দুর্গবাড়ির খবর কে বলতে পারবে?

: ঐ বাড়িটাতো হইলো গিয়া যতো সর্বনাশের ঘাঁটি। বিপদের নিশানা।

: কেন?

: যখনি কেউ আসে ঐ বাড়িতে তখনি কি একটা যেন গোল-মাল শুরু হয়। এখন দেখি আবার রাইতে আলো জ্বলে। দরজা জানালা খোলে। কয়েকদিন ধইরা দেখতাছি রক্তবরণ বাজ উড়তাছে। কি এক ভয়ংকর জন্তুও বাইর হয় ঐ কবর খানার জংগল থেইকা। অনেকগুলা মানুষরে খামচাইছে। কয়েকটা বাচ্চাও নাকি ধইরা নিয়া গেছে। সন্ধ্যার পর এখন তাই বাইর হইতে ডর লাগে।

: ঐ বাড়িতে কে থাকে?

: তা আমরা কইতে পারুম না। এক সাহেব আইছে শুনছি।

: তাকে কেউ দেখেছো?

: না।

কুচকুচে কালো এক জেলে ফয়সালের কানের কাছে মুখ এনে

ফিস ফিস করে বলে

: আমি দেখছি। সাংঘাতিক দেখতে।

: কি ভাবে দেখলে ?

: আমি মগ মাচাংরে সমুদ্র থেইকা ঝিনুক আইনা দেই। মাচাং সেই ঝিনুকের শাঁস দিয়া খাবার বানায়। সেই খাবার নিয়া যায় ঐ বাড়িতে। আমারে একদিন নিয়া গেছিল। খুব সাবধানে।

: ঐ বাড়িতে যাবার রাস্তা তুমি জানো ?

: জানি। গোপন একটা রাস্তা আছে। কুয়ার ভেতর নাইমা যাইতে হয় সেইটাও চিনি। খুব অন্ধকার। সাপের ভয়।

ফয়সাল লোকটিকে একপাশে টেনে নেয়।

: শোন, তোমার সাথে আমাদের দরকারী কাজ আছে। কাজটা করে দিতে পারলে তোমাকে অনেক টাকা দেব।

টাকার কথা শুনে জেলেটি উৎসাহিত হয়।

: আজ রাতে আমাদের সেই বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

: ডর লাগে। সাপের ডর।

: ঐ গোপন রাস্তা দিয়ে।

: যদি ঐ জন্তুটা বাইর হয় ?

: আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। বন্দুক আছে। ঐ জন্তুটা ক্ষতি করতে পারবে না।

লোকটির হাতে কড়কড়ে কয়েকটা নোট গুঁজে দেয় ফয়সাল। জেলেটির মুখে খুশি ছড়িয়ে যায়।

: আমরা কিয়াং এর কাছে থাকবো। তুমি বিকেলে সেখানে আমাদের সাথে দেখা করবে। এসব কথা যেন কেউ জানতে না পারে। সম্ভব হলে আরো কিছু খবর জোগায় করো। ঐ সাহেবের খবর।

হিমছড়িতে ভালো থাকার জায়গা নেই। ওরা একটা ছোট হোটেলে ওঠে। এক বৃদ্ধ হোটেলটা চালায়। ওদের দেখে খুশি হয়। এখন লোকজন বেশী আসে না। খদ্দেরের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়।

: কি চাচা, খাবার আছে কি?

: লাক্কা আর রূপচান্দার ভাজি। এমন টাটকা মাছ আর কই পাইবেন।

: থাকার জায়গা।

: খুব সুন্দর। সমুদ্রের বাতাস আসে।

: হোটেলে লোক নাই কেন?

: হিমছড়িতে ডর আইছে। তাই এই অবস্থা।

: সেটা আবার কি?

: কেউ কয় রক্ত চোষা। কেউ কয় সাগর শয়তান। তার ডরে সন্ধ্যার পর সব খালি। তাই আমার হোটেলের এই অবস্থা।

রূপচাঁদার ভাজি দিয়ে সবাই ভাত খেয়ে নেয়। চমৎকার রান্না। পেঁয়াজ কলি মেশানো। হোটেল মালিক অনেকদিন রেংগুনে ছিলেন। ওদের কাছে সোয়ে ডাগন এর গল্প বললেন।

কতো দামী দামী পাথর সেখানে। দেখে চোখ ঝলসে যায়। খাবার পর ফয়সাল ঝটপট সবাইকে কিছু কাজ ভাগ করে দেয়। তকিকে বলে ব্ল্যাক আর্টের ইতিহাস থেকে প্রেত সাধকদের কথা জানতে। কিভাবে তারা সাধনা করে। তাদের অনুষ্ঠানের উপাচার কি। নীল চোখের ছেলেদের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি। কেন চায় নীল চোখের ছেলেদের।

: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দুর্গবাড়ির বেনিত্তা নামের লোকটা এক প্রেত সাধক। কারো মৃত আত্মাকে জাগাতে এখানে এসেছে সে। ঘটনাগুলো পর পর সাজালে তাই মনে হয়।

তকি বই খুলে পড়তে থাকে। প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করে। ফয়সাল পরে সব জানতে চাইবে।

আঞ্চরামকে দায়িত্ব দেয়া হয় বিকেলের মধ্যে মগপাড়ায় গিয়ে মাচাং সম্পর্কে আরো খোঁজ নেবার জন্যে। এই রহস্যে মাচাং এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তার সাথে বেনিত্তার যোগা-যোগ রয়েছে।

আশরাফের নীল চোখের জন্যে ভয়। যতো আক্রমণ ঘটছে ওর ওপর। আশরাফ তাই আপাতত বেরুবে না। হোটেলেই থাকবে। লিপন দুর্গবাড়ির একটা ম্যাপ তৈরি করবে। ও ছদ্মবেশে যাবে। ছদ্মবেশ নিতে লিপন খুব পটু। কিছুক্ষণের মধ্যেই লিপন একজন জেলে যুবক সেজে আসে। ফয়সাল আবার জেলেপাড়ায় যায়। ওখান থেকে যাবে মগপাড়ায়।

তকি ব্ল্যাক আর্টের ইতিহাসে ডুব দেয়। বের করে ভ্যাম্পা-

য়ারের অধ্যায়। ভ্যাম্পায়ার হলো রক্তচোষা। পর্তুগীজ ভ্যাম্পায়ারদের এক অধ্যায়ে এসে চোখ আটকে যায়। সেখানে লেখা, অনেক ভ্যাম্পায়ার নীল চোখের ছেলেদের মণি থেকে শক্তি পেতে চায়। এটাই ওদের স্বাতন্ত্র্য।

এরা দিনে ঘুমোয়। রাতে শিকারের খোঁজে বের হয়। ভ্যাম্পায়াররা আন ডেড।

এদের ঠোঁট পাতলা। টকটকে লাল। শ্বদন্ত অন্য দাঁতগুলোর চাইতে অনেকখানি লম্বা। সূঁচালো। এই ধারালো দাঁত ঘাড়ে ফুটিয়েই সে রক্ত পান করে। বহুদিন আগে মারা যাওয়ার ফলে ওজন কমে ভ্যাম্পায়ার হবে পাতলা। কিন্তু আকণ্ঠ রক্ত পান করার পর তাকে খানিকটা মোটা দেখাবে। ভ্যাম্পায়ারের চাই শুধু রক্ত।

সে থাকে কফিনের ভেতরে। বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে। দীর্ঘ সময় ধরে শুয়ে থাকে। বড় বড় লোম। ভ্যাম্পায়ারের চামড়া ঠাণ্ডা। বরফের মতো। তার যখন খিদে লাগে তখন চোখ থেকে একটা আভা বেরোয়। তার হাতে লম্বা, বাঁকানো নখর। কানের ডগা তীক্ষ্ণ। গায়ে ভ্যাপসা পচা গন্ধ।

বইটিতে ভ্যাম্পায়ার কাউন্ট ড্রাকুলার একটি কাহিনী আছে। ঘটনাটি তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। 'মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ছোট দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো হ্যারি। একটা ঘোরানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচে পাতালপুরীতে।

অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো সে। চারদিকে রহস্যময় আবছা অন্ধকার। এটা পারিবারিক কবরখানা। পলেস্তরা খসে গেছে ছাদের। মাটির নিচে পাতালপুরীতে আঁধারের এই ঘরে কেবল মাত্র অতি যত্নে রাখা একটি প্রকাণ্ড ডালা বন্ধ কফিন। ওপরে লেখা একটি নাম কাউন্ট ড্রাকুলা।

প্রভু ড্রাকুলা, হে প্রভু ড্রাকুলা। সময় হয়েছে। এবার ওঠো তুমি। মনে মনে প্রার্থনা করলো হ্যারি। সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে এলো সে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে লিলি এবং জেমস।

ঠক ঠক ঠক। মৃদু হাতে দরজায় টোকা দিলো হ্যারি। জেগেই ছিলো জেমস এবং লিলি। দরজায় টোকা শুনে এক লাফে নেমে এলো জেমস। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

হাতে মোমবাতি। দপ করে জ্বলে উঠলো ওর দুই চোখ তীব্র কৌতূহলে। একটা ভারী বাক্স ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে হ্যারী। ওকে অনুসরণ করতে শুরু করলো জেমস। কি আছে বাক্সে। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো হ্যারি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

ভারি কফিনটার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। মাথা নিচু করে কফিনের গায়ে লেখা নামটা পড়তে শুরু করলো—কাউন্ট ড্রাকুলা।

ঠিক এমনি সময় ওপর থেকে এলো আক্রমণটা। জেমসকে

বিন্দুমাত্র সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ওপরে ঝুলানো দামী সিল্কের পর্দা ঝুপ করে পড়লো ওর মাথার ওপর। ছিটকে মোমবাতিটা উড়ে গেল কোথায় জানি। ভারি পর্দার ঝাপটায় ভারসাম্য হারালো ও। সাথে সাথেই অনুভব করলো কে যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওকে কফিনের ওপর। পাগলের মত ভারি পর্দা মুখ থেকে সরিয়ে দিলো জেমস। বিস্ফারিত চোখে দেখলো হ্যারির ভয়াবহ মুখ। হাতে উদ্যত ছুরি। কিছু চিন্তা করার আগে গলায় প্রচণ্ড আঘাত খেল জেমস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করলো ওর গলা দিয়ে। জ্ঞান হারালো জেমস।

ওর গলায় ছুরি চালিয়ে গলাটা দু'ভাগ করে ফেললো হ্যারি। এবার গল গল করে রক্ত ঢুকে যাচ্ছে কফিনের ভেতর বড় একটা ফুটো দিয়ে। এবার জেমসের দুই পায়ে রশি বেঁধে ওপরে তুলে নিলো মৃত লাশ। মুণ্ডুহীন লাশ কফিনের ওপর ঝুলছে। কফিনের ডালা খুলে দিলো, ফেলে দিলো মাটিতে। মুণ্ডুহীন লাশ ছুরি দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করতে শুরু করলো হ্যারি। রক্তের বন্যা শুরু হলো। তীব্র আগ্রহে সেদিকে চেয়ে আছে সে। প্রভুর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করেছে সে। এবার শুধু প্রতীক্ষা। হঠাৎ করেই বদলে গেল ঘরের শান্ত চেহারা। কোত্থেকে যেন প্রবল হাওয়া ঢুকছে সারা ঘরে প্রবল বেগে। কফিনের মাঝে হঠাৎ করেই ধোঁয়া দেখা গেল এবার। শূন্য কফিন ভরে গেছে কালো ধোঁয়ায়। পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে

ওপরে। তারপর নেমে আসছে নিচে। ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় মিলিয়ে গেল।

সহসা একটা শীর্ণ হাত চেপে ধরলো কফিনের কিনারা। মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল তীব্র আর্তনাদে। প্রভু ড্রাকুলা জেগেছে।

ওর দিকে এগিয়ে আসছে কালো মূর্তিটা। মানুষই। কিন্তু কোন মানুষের এমন বীভৎস চেহারা আর দেখা যায় না। মড়া মানুষের মতো ফ্যাকাশে মুখ। চোখ দুটো লাল টকটকে।

তকি এক অদ্ভুত পৃথিবীর সন্ধান পায় বইতে। হোটেলের জানালা দিয়ে দেখা যায় ঝকঝকে নীল আকাশ। মেঘে ভেসে যাচ্ছে। উড়ছে গাঙচিল। চারদিকে আলো ঝলমল পরিবেশ। অথচ এই বই এর পাতায় বিভীষিকার জগত। কুটিল অন্ধকারের পৃথিবী। তকি সেই বইতে খুঁজে পায় আশ্চর্য ঘটনা।

১৯৩৪ সালে জন ডিলিংগার নামে একজন কুখ্যাত হত্যাকারী এবং শয়তান উপাসক এফ. বি. আই এজেন্টের হাতে নিহত হয়। ডিলিংগারের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা সবার জানা ছিল। তার মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র সবাই ভিড় জমালো ঘটনাস্থলে। সবাই তার রক্ত সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে

উঠলো। পুরুষরা নিলো রুমাল ভিজিয়ে। মহিলারা স্কার্টের কোণা সেই রক্তে ভেজালো। তাদের বিশ্বাস ছিল যদি ডিলিংগারের রক্ত তারা ধারণ করে তাহলে তার আধ্যাত্মিক প্রভাব তাদের উপর পড়বে।

শয়তান উপাসকরা প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয় বলে জানা যায়। সারাক্ষণ এরা নিজেদের জাদুচক্রের গণ্ডীর ভেতরে আবদ্ধ রাখে। এক অদৃশ্য দেয়াল এদের বাইরের আঘাত থেকে অনেক সময় রক্ষা করে।

একজন জ্ঞানী মানুষের রক্ত বা তার শরীরের কোন অংশ কেউ যদি খেতে পারে তাহলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তির গুণাবলী দ্বিতীয় ব্যক্তির ভেতরে সঞ্চারিত হয়। এই রকম এক ধারণা থেকে শয়তান উপাসকরা প্রচুর জ্ঞানী ব্যক্তিকে ব্যবহার করেছিল। বিভিন্ন অশুভ প্রক্রিয়ায় এই সকল ব্যক্তিকে হত্যা করা হতো। জ্ঞানী ব্যক্তিদের পুরোপুরি নিজেদের কাজে লাগানোর জন্যে কখনো তাদের জোম্বি বানিয়ে রাখা হতো। জোম্বি বানানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে—যাকে জোম্বি বানাতে হবে তাকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় প্রায় হত্যা করতে হবে। প্রায় হত্যার অর্থ হচ্ছে কিছু সময়ের জন্যে তার আত্মা দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবে। মৃত ব্যাক্তিটিকে যখন তার পরিজনরা কবর দেবে তারপর সুযোগ মতো কবর থেকে তার দেহ তুলে আনতে হবে। প্রায় মৃত দেহের ওপর মন্ত্রপ্রয়োগ করে আত্মাকে ফিরিয়ে এনে পুণর্বার প্রতিষ্ঠিত করলেই সেটা জোম্বি হয়ে

যাবে। এই জোস্নি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হবে, যে তাকে বর্তমান রূপ দিয়েছে।

এসব পড়তে পড়তে তকির মনে হয় এই চারপাশের পৃথিবীতে কতো কি যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটছে।

ফয়সাল হাঁটতে হাঁটতে দুর্গবাড়ির কাছে চলে আসে। জায়গাটি খুব নির্জন। আগাছার ভেতর দিয়ে দুর্গবাড়ির কোন কোন অংশের ধূসর ইট দেখা যায়। সবুজ পাতার উপর দিয়ে একটা গম্বুজের চূড়া দেখা যাচ্ছে। গম্বুজের ভেতরে একটা গাঙচিল উড়ে এসে বসে। সামুদ্রিক পাখিরা বোধ হয় ওখানে বাসা বেধেছে। ঝিমঝিম করছে রোদ। এই বাড়িটি রাতের অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে ওঠে। ফয়সাল বাড়িটির পেছন দিকে যায়। দীঘল শনঘাসের বন। ওখানে নাকি একটা হিংস্র জন্তু থাকে। ভয় নেই। ফয়সালের কাছে গুপ্তি লাঠি আছে। সেটা দিয়ে বুনো ঝোপে বাড়ি মারে। কয়েকটা ছোট গিরগিটি পালায়। ফয়সাল ভাঙ্গা পাঁচিল গলে ভেতরে ঢোকে। কেমন একটা পচা গন্ধ। কোথাও বুঝি মৃত পশু পচছে। বাতাসে ছম-ছম করছে ঘাসবন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর চোখে পড়ে কবর-খানার দেয়াল। পাথরে পর্তুগীজ ভাষায় কি সব লেখা। সামনে একটি ঘর। দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢোকে ফয়সাল। নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে। আবছা অন্ধকার। ফয়সাল সিঁড়ি

দিয়ে নামে। সামনে একটি পাথরের ঢাকনা দেয়া কফিন। ডালাটা একটু সরানো। কি এক কৌতূহলে কাছে এগিয়ে যায় ফয়সাল। ডালার কোণায় রক্তের দাগ। এক জায়গায় ইংরেজী এবং পর্তুগীজ ভাষায় নাম লেখা। ইংরেজী অক্ষর-গুলো পড়ার চেষ্টা করেন সিস্তান বাতিস্তা। পেছনে ঠক করে শব্দ। চমকে তাকায় ফয়সাল। একটা বেজী পালায়। সিস্তান বাতিস্তা কি ভ্যাম্পায়ার। রক্তচোষা। তাকে জাগাতে এসেছে বেনিস্তা। এক জায়গায় কয়েকটা মৃত পাখি। বেগুনি ফুল। লক্ষণগুলো চিনতে পারে ফয়সাল। কফিনের ভেতরে শুয়ে থাকা মৃত আত্মাকে জাগাবার চেষ্টা চলছে। ফয়সাল কবর-খানা থেকে বেরিয়ে আসে।

তকি তখনো বই পড়ছে। আশরাফ ঘুমিয়ে আছে। আকরাম কৌশলেই খবর নিয়ে এসেছে মাচাং এর কাছ থেকে। জেলে হিশেবে আকরাম তাকে বেশ কিছু নতুন ধরনের ঝিনুক চিনিয়ে দিয়েছে। সেন্ট মার্টিনস থেকে আনা শুকনো শ্যাওলা দিয়েছে। এই শ্যাওলা পেয়ে মাচাং খুব খুশি। তার এধরনের জিনিশের প্রয়োজন। মাচাং এর কাছ থেকে জেনেছে আজ রাতে ঐ দুর্গবাড়ির সাহেব নাকি কবরখানায় গিয়ে এক অনুষ্ঠান করবে। সেখানে এক মৃতদেহ আছে। তার জন্যে মাচাংকে বলেছে রক্ত দিয়ে স্যুপ বানাতে। মাচাং বুঝতে পারছে না

কবরখানার মৃতদেহ খাবার নিয়ে কি করবে। সাহেবের যতো উদ্ভট চিন্তা।

আকরামের কথা শুনেই বুঝতে পারে ফয়সাল। আজ রাতে দুর্গবাড়ির কবরখানায় সিস্তান বাতিস্তাকে ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করার সাধনা চালাবে বেনিত্তা।

: তবে, ভ্যাম্পায়ার বিনাশের পথ কি?

: ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে ক্রুশ খুব কাজের জিনিশ। ভ্যাম্পায়ার যদি কফিন ছেড়ে উঠেও আসে, ক্রুশ দেখলে তাকে থামতে হবে। ক্রুশটা যদি রূপোর হয় তা হলে বেশি কাজ দেবে। রসুনও ভ্যাম্পায়ারকে দূরে রাখে।

: আর কিছু?

: ভ্যাম্পায়ার এবং অয়্যার উলফ দুটোই রূপোর বুলেটের কাছে অসহায়। কাঠের দণ্ড ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় অস্ত্র। কফিনে শুয়ে থাকার সময় কাঠের দণ্ড ঢুকিয়ে দিতে হবে ভ্যাম্পায়ারের হৃৎপিণ্ড বরাবর। মাথার পাশ দিয়ে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিতে হবে। লাশ বের করে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে হবে গনগনে চুল্লিতে।

সবাই জড়ো হয়েছে ঘরে। ফয়সালকে গম্ভীর দেখায়।

: আজ রাতে আমরা দুর্গবাড়ির কবরখানায় যাবো। আমি একটি ঘটনার আশংকা করছি। সেখানে বেনিত্তা নামের এক পর্তুগীজ এসেছে। কবরখানায় তার এক পূর্বপুরুষের কফিন আছে। নাম সিস্তান বাতিস্তা। আমি একটু আগে ঐ কবর-

থানায় প্রবেশ করেছিলাম।

: একলা! সাংঘাতিক!

: আমার এখনো কোন ক্ষতি হয়নি। আমরা সেন্ট মার্টিনসে আসার পর থেকে বেশ কটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

: আমরা এখানে এসেছিলাম এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে। কিন্তু ঘটছে ভয়ংকর সব ঘটনা। হত্যা করা হচ্ছে নীল চোখের ছেলেদের।

: শয়তান উপাসনার এক রহস্যময় বলয়ে আমরা এসে পড়েছি এখন। কয়েকটি ঘটনা থেকে ধারণা করছি আজ রাতে ঐ কবরখানায় ভয়ংকর একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

: কি হতে পারে সেখানে?

: বেনিত্তা সিস্তান বাতিস্তার মৃতদেহকে ভ্যাম্পায়ার বানাবার চেষ্টা করবে।

: এও কি সম্ভব! আজকের দিনে।

: যারা উইচক্রাফটের কথা জানে তারা বুঝবে এসব ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে। এখনো ইউরোপ, আমেরিকায় ডাইনিদের গ্রাম রয়েছে। এখনো গোপনে অনেকে প্রেততত্ত্বের চর্চা করে।

: প্রেততত্ত্ব! দুর্গবাড়িতে প্রেতের আগমন ঘটবে! রক্তচোষা প্রেত!

: এখনো এই রহস্য মানুষকে আলোড়িত করে। সাম্প্রতিক কালে প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন এক শয়তান উপাসকের পরিচয়

পাওয়া গেছে। যার নাম হচ্ছে এলিষ্টর ক্রাল। তার শিষ্য সারা ইউরোপ জুড়ে। ১৮৭৫ সালে তার জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তার অবস্থানের কথা জানা গেছে। শেষ-বার ১৯৩৮ সালে তাকে দেখা গিয়েছিল সিসিলিতে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়েছে।

: ভ্যাম্পায়ারকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।

: ভ্যাম্পায়ারদের কি ভাবে বিনাশ করতে হয় তা জেনেছি। এখন আমদের একটা ক্রশ বানাতে হবে। ভ্যাম্পায়ার হবার আগেই সেই দেহকে কুপিয়ে কাটতে হবে। আগুনে পোড়াতে হবে।

: এখন গিয়ে করে আসলে হয় না।

: না। এগুলোর জন্যে বিশেষ সময় আছে।

: চেকোশ্লোভাকিয়ার কাহিনী। একজনকে ভ্যাম্পায়ার সন্দেহে তার কবর খুঁড়ে মৃতদেহ তুলে হৃৎপিণ্ডে কাঠের সূচালো দণ্ড চালিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তারপরেও তাকে গ্রামের এখানে সেখানে দেখা যেতে থাকে। আবার তাকে ধরে প্রথমে ফাঁসি দিয়ে পরে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এরপর আর তাকে দেখা যায় নি।

: হিমছড়িতে সন্ধ্যার পর এক অদ্ভুত জন্তুকে দেখা যায়। মানুষকে আক্রমণ করে।

: ঐ চেক দেশের কাহিনী। ১৭০৬ সালে একজন মহিলাকে কবর দেয়ার চারদিন পর গ্রামে একটা দৈত্যাকায় প্রাণী

দেখা গেল। কখনো কুকুরের রূপ নিয়ে মানুষের গলা টিপে ধরে। গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে কবর খুঁড়ে মহিলার লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলে।

ওরা সবাই অনুভব করলো রহস্যের কুয়াশা ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা।

বিকেলে মগপাড়ার কিয়াং এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কিছুক্ষণ পর সেই কালো জেলেটা এলো।

: মাচাংকে খুব ব্যস্ত দেখলাম। আজ রাতে নাকি দুর্গবাড়িতে অনুষ্ঠান হবে।

: কি অনুষ্ঠান?

: তা বললো না। একটা ঠোঙায় করে কয়েকটা কাটা আঙুল নিয়ে গেল।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠলো।

: কিসের কাটা আঙুল?

: মানুষের বলেই তো মনে হলো। তবে ছোট ছোট আঙুল। না জানি আর ক'জন নীল চোখের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে এর মধ্যে। প্রেতাত্মার থাবা বেড়েই চলেছে।

কৃষ্টাল বলের সামনে ঝুঁকে আছে বেনিতা। তাকে কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছে। সবগুলো নীল চোখো ছেলের চোখের

মণি পাওয়া যায় নি। কালা শয়তান তার সর্বনাশ করেছে। ঠিক সময়ে জোগাড় করতে পারেনি জিনিশগুলো। তার উপযুক্ত শাস্তি পেতে হয়েছে তাকে। মাচাং কয়েকটা মণি এনেছে। আজ রাতে সিস্তান বাতিস্তার ভেতরে শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে। গুপ্তধনের হদিশ চাই। কালো বেড়ালের মূর্তির খোঁজ চাই।

'সিস্তান বাতিস্তা আন ডেড। মৃত্যুর পরেও যারা বেঁচে থাকে তারাই আন ডেড। কেউ মারা যাবার পর তার আত্মা চলে যায় সৃষ্টিকর্তার কাছে। কিন্তু কোন কোন অশুভ শক্তির আত্মা সেখানে যায় না। তাদের মৃতদেহে প্রাণের পুনঃসঞ্চার হয়। তারা জীবিতদের রক্ত পান করে টিকে থাকে এই পৃথিবীতে।'

পুথিতে এ কথাগুলো লেখা ছিল। কালো আলখাল্লার ভেতর থেকে ধূসর শেকড় বের করে জ্বালে। অদ্ভুত একটা গন্ধে তখন ভরে যায় ঘরটা। এই গন্ধ পেয়েছিল লিসবনের কবরখানার ঘাসবনে। জিপসিদের পাহাড়ি গুহাতে। ফিসফিস করে বলে বেনিস্তা।

—বাতিস্তা। তুমি জাগবে আজ। জাগতেই হবে। গুপ্তধনের সন্ধান চাই আমার।

দরজার কাছে মাচাং এসে দাঁড়ায়।

: পেয়েছো ?

: পেয়েছি।

: ক'টার ?

: তিনটার ;

: কেমন করে পেলে ?

: একটা খেলছিল। বিছার কামড়ে পড়ে গেল। বাকিরা পালালো। ওকে টেনে নিয়ে গেলাম ঝোপে। সাপের ছোবল দিলাম।

আবছা অন্ধকারে বেনিত্তার চোখ তখন সীয়ামিজ বেড়ালের মতো জ্বলে। মাচাংকে তখন কেমন নিষ্ঠুর দেখায়।

: আরেকটা ফিরছিল ঝাউবনের ভেতর দিয়ে। খাঁচা খুলে দিলাম। মাথায় ঠোকর খেতেই ছেলেটা চেচালো। তার চোখে মুখে তখন পাতার রস ছড়িয়ে দিলাম।

: আঙুল ?

: সব এনেছি।

: মহান লুসিফারের জয়।

ঝাউবনে জোনাক জ্বলছে। অদ্ভুত জন্তুর ভয়ে সমস্ত হিমছড়ি নীরব। লোকজন ঘরের ভেতরে।

দু সাহসী পাঁচজন এসে দাঁড়ালো দুর্গবাড়ির পেছনে। অন্ধকারের চাদর ঝুলছে চারদিকে। কচকচ শব্দ। মোমবাতি

জ্বালে লিপন। টিবির ওপর বসে একটা কালো বেড়াল কি যেন চিবিয়ে খাচ্ছে। পাশেই শকুনের একটা মরা বাচ্চা। আশ্চর্য, কালো বেড়ালটা তাদের দেখে পালালো না। লিপন এগিয়ে যেতেই ফ্যাঁচ করে উঠলো।

ফয়সাল কবরখানায় যাবার রাস্তাটা মনে রেখেছে। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ওরা হাঁটতে থাকে। অন্ধকারে সামনে কি যেন জ্বলছে। সেই জন্তুটা। ফয়সাল টর্চ জ্বালে। চাপা গর্জন করে একটা জন্তু ওদের দিকে ছুটে আসে। আকরাম গুপ্তি লাঠির ছুরি বাগিয়ে ধরেছিল। টর্চের আলোতে জন্তুটা ঘাবড়ে গিয়ে লাফ দেয়। কৌশলে লম্বা ছুরিটা ধরে রেখেছিল আকরাম। জন্তুটা যেন উড়ে এসে সেই ধারালো অস্ত্রে গেঁথে গেল। বুকের অনেকটা অবধি ঢুকে গেছে ছুরি। মাটিতে চেপে ধরলো জন্তুটাকে। নেকড়ের মতো একটা প্রাণী। তকি আর ফয়সাল ওটাকে কুপিয়ে মারলো।

কবরখানার ভেতরে কফিনের সামনে হরিণ ছালের সামনে বসে আছে বেনিত্তা। মোমবাতির মৃদু আলো। দুঃসাহসী পাঁচজন পেছনে এসে দাঁড়ায়।

বেনিত্তা চিৎকার করে ওঠে। কফিনের ঢাকনা সরে যাচ্ছে।

—সিস্তান বাতিস্তা!

ওরা পাঁচজন তখন ছুটে যায় ভেতরে। ফয়সালের হাতে ধরা ক্রশ।

বেনিত্তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। এরা কারা? কোত্থেকে এসেছে? বেনিত্তা ক্রুশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আকরাম কফিনের পাথরের ঢাকনা সরিয়ে ফেলে। বুকের কাছে আড়া-আড়িভাবে হাত রেখে সিস্তান বাতিস্তার আনডেড শরীর। ভ্যাম্পায়ার হতে পারেনি এখনো। লিপন আর তকি মিলে সবশক্তি দিয়ে কাঠের সূচাঁলো দণ্ডটা বিধিয়ে দেয় বাতিস্তার হৃৎপিণ্ড বরাবর। আর্তনাদ করে ওঠে বেনিত্তা। ফয়সাল ধারালো অস্ত্র বের করে। সতের শতকের পর্তুগীজ জলদস্যু সিস্তান বাতিস্তাকে কুপিয়ে কাটতে থাকে। প্রেতাত্মার বিনাশ চাই। অশুভ শক্তিকে শেষ করতে হবে। এক পাশে আশরাফ আগুন জ্বালে। বাতিস্তার দেহকে পোড়াতে হবে।

ওরা যখন কফিনের ভেতরে মৃতদেহটাকে কোপাতে ব্যস্ত তখন চুপিসারে পেছনে হঠতে থাকে বেনিত্তা। তার অশুভ শক্তির বলয় এখন নষ্ট হয়ে গেছে। কোন শক্তি এখন কাজ করবে না। বেনিত্তা পালাতে থাকে। আশরাফ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে

: পালালো। বেনিত্তা পালিয়ে গেল।

ওরা দেখে বেনিত্তা ছুটে ঘাসবনের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। অন্ধকারে তাকে ধরা যাবে না।

সিস্তান বাতিস্তার লাশটা পোড়াতে পোড়াতে মাঝ রাত হয়ে এলো। রক্তচোষার কবল থেকে মুক্ত হলো হিমছড়ি।

ওরা পাঁচজন বাইরে এসে দাঁড়ায়। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই ভোর হবে। সোনালি আলোতে ঝলমল করে উঠবে পৃথিবী। সাগর পাখিরা মেলবে ডানা।

এর মাস তিনেক পরে পত্রিকায় একটা খবর দেখে চমকে উঠলো ফয়সাল।

'সিলেটের ধামাই চা বাগানের পাহাড়ি ঝর্ণাতে কটি কচি শিশুর লাশ পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি শিশুর চোখ তুলে ফেলা হয়েছে।'

এই বীভৎস খবরটা পড়ে ফয়সালের মনে হলো তবে কি বেনিত্তা আবার শয়তান হয়ে ধামাই বাগানে এসেছে!

———

High Quality Aohor Arsalan Scan

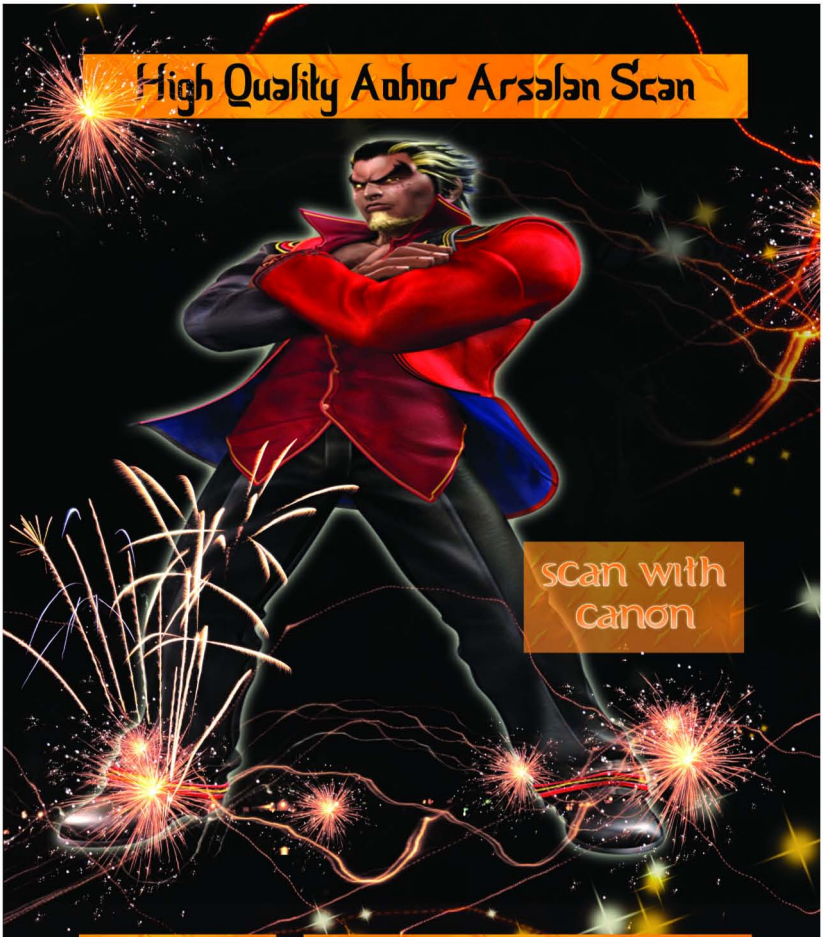

scan with canon

Aohor Arsalan

ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now

WWW.BANGLAPDF.NET